ডিসেম্বর ২০১৯ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মহান বিজয়
আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন

'৭১ এর শহিদ ক্রিকেটার

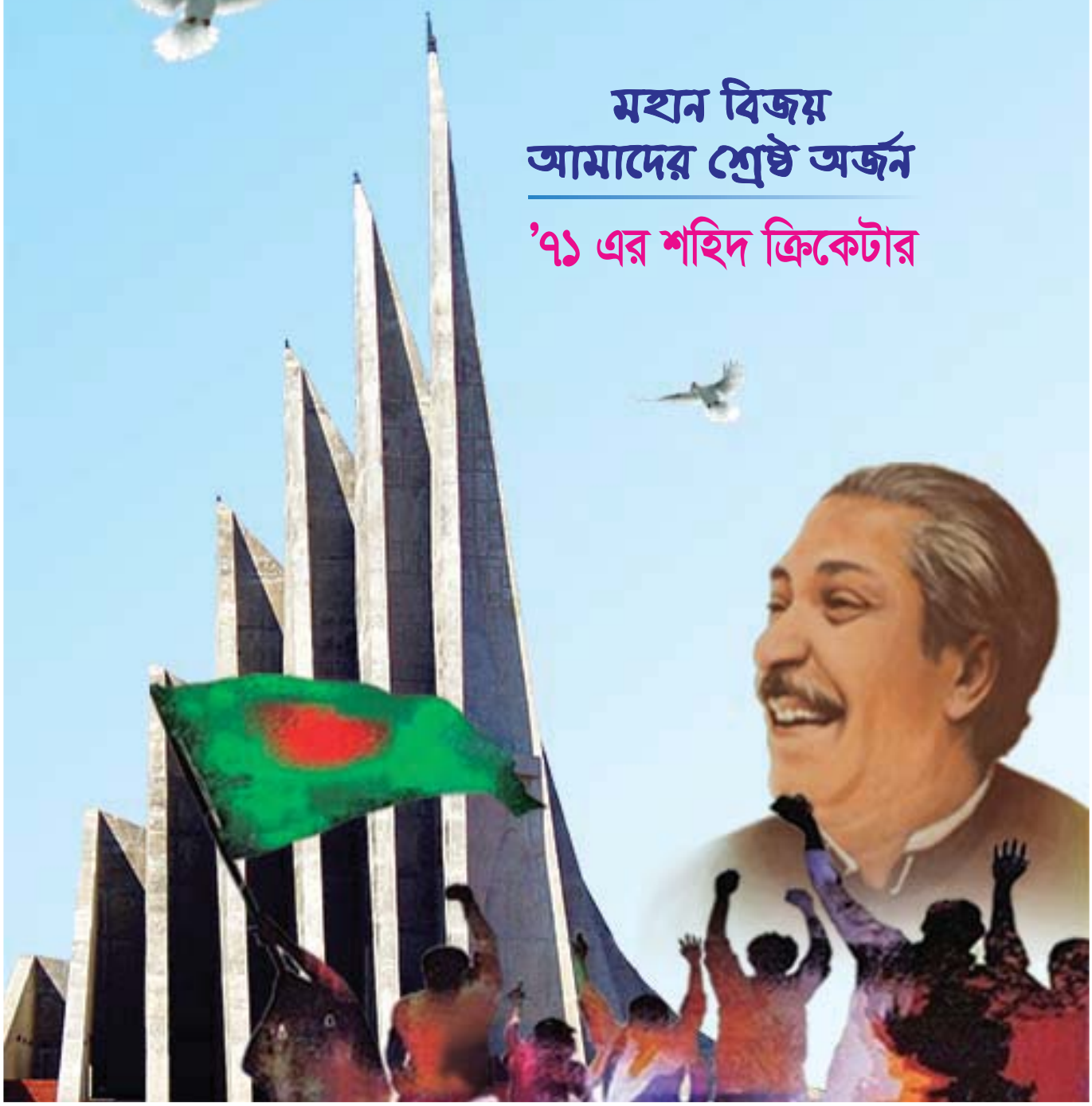

তাসনীম ফেরদৌস শান্ত, সপ্তম শ্রেণি, কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ

রাফান ইবনে মেহেদী, তৃতীয় শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ডিসেম্বর ২০১৯ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

ডিসেম্বর মাস এলেই মনে পড়ে যায় বিজয়ের কথা। এই দিনেই আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ ও একটি লাল সবুজ পতাকা। যে মানুষটির হাত ধরে আমরা পেয়েছি এই মহান বিজয়, তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বানেই এই দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নয়মাস মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সমগ্র জাতি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করে মহান বীর শহিদদের। যাদের আত্মত্যাগেই অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

ছোট্ট বন্ধুরা, ২০২১ সালে উদ্‌যাপিত হবে মহান বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে সারা বিশ্বে । এই আনন্দের সুর বেজে উঠেছে আকাশে-বাতাসে, সকল মানুষের মনে। বন্ধুরা, নবারুণের এ সংখ্যাটি সেজেছে বিজয়ের নানা লেখনীতে। পড়ে জানাবে কিন্তু, কেমন হলো?

সূচি

নিবন্ধ

০৩ মহান বিজয় আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন
দেলোয়ার হোসেন

০৯ কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা/ রেহমান সামি

১১ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ/ তানজিদ নূর রাফি

১৩ '৭১-এর শহিদ ক্রিকেটার/ সুফিয়ান হায়দার

১৬ ১৯৭১-এ কেমন ছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অবস্থা
ইমরুল ইউসুফ

৩৮ শীতের পাখি/শেখ এ কে এম জাকারিয়া

৪৮ বিজয় ফুল উৎসব ২০১৯/ আলেয়া রহমান

৫০ অন্য বাংলাদেশ/শাহানা আফরোজ

৫৩ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার : ডিএফপির সেরা অর্জন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৫৪ বাংলাদেশের রেকর্ড সাফল্য/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৫৬ সুস্বাস্থ্যে পানি পান/মো. জামাল উদ্দিন

৫৭ প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে: প্রধানমন্ত্রী
মো. তৈয়ব হোসেন

৫৯ এস এ গেমসে লাল-সবুজের সাফল্য
মেজবাউল হক

৬০ কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান
জান্নাতে রোজী

৬২ দশদিগন্ত/ রাজিউর রহমান

৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

গল্প

০৭ একটি পতাকার গল্প/ কাজী তানভীর

২০ এই আমাদের পতাকা/রফিকুর রশীদ

২৬ বাল্যবন্ধু/জোহরা শিউলী

২৯ মামার গল্প বলা/ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

৩২ টুনুর একদিন/ইউনুস আহমেদ

৩৪ সমার্থক শব্দ/তারিক মনজুর

৪৩ প্রশ্ন কন্যা/রাহান তাপস

৪৫ সাহসী মোরগ/আবুল বাসার

কবিতা

১৯ মঈনুল হক চৌধুরী

২৫ মুহাঃ রাকিবুল ইসলাম/শাহীন রায়হান
মো. ইহসান আহমেদ/আবুল হোসেন আজাদ

৩৬ মেশকাউল জান্নাত বিথী

৩৭ তারিকুল ইসলাম সুমন/অনিক মাযহার
ছাদির হুসাইন ছাদি

৪১ আহসানুল হক

৪২ রিপলু চৌধুরী/সাবরিনা আক্তার

৫৩ লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

৫৫ মুশফিকুর রহমান মিদুল

৬১ শিউলী আক্তার

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: তাসনীম ফেরদৌস শান্ত, রাফান ইবনে মেহেদী
শেষ প্রচ্ছদ: তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ

২৩ দেবজ্যোতি রায়

২৮ মো. আবদুল্লাহ আল মুইয়্যু

৩১ সাফওয়ানা শফিক সাফা

৩৩ তাসনোভা আলম লিসান

৪৬ নিখিল দাস

৪৯ সাদিয়া হোসেন মিম/মো. আমিমুল ইহসান

৬১ জায়েদ বিন রাকিব

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

মহান বিজয় আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন

দেলোয়ার হোসেন

পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল, এই সত্যটা আমরা সবাই জানি। আর এ কথাও জানি যে, এই একভাগ স্থলে কত দেশ, কত জাতি আর কত মানুষের বসবাস। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই শক্তিশালী মানুষ, গোষ্ঠী এবং দেশ দুর্বলের উপর অত্যাচার, অবিচার করে আসছে। স্ববলেরা দুর্বলের উপর শাসনভার চাপিয়ে করছে লুটপাট, হরণ করছে মানবিক অধিকার, শ্রম এবং ক্ষুধার অন্ন। এই পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে সব মানুষের। সবাই চায় একটু সুখশান্তি। তারপরও বাকি থেকে যায় জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া– যার নাম স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা ছাড়া মানুষ কখনো মানুষের মতো বাঁচতে পারে না।

একটি পাড়া অথবা একটি গ্রাম যেমন ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে – তেমনি একটি অঞ্চল বা একটি দেশের মানুষ বাঁচতে চায় মাথা উঁচু করে হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে। একটি দেশের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি অন্য দেশের মতো নয়, মানুষ নিজের দেশে নিজেদের মতো করে বাঁচতে চায়। চায় দেশের একটি সীমারেখা। সেখানে থাকবে না অন্য কোনো দেশ বা জাতির শাসন ও শোষণ। অর্থাৎ একটি স্বাধীন দেশ।

পৃথিবীর বুকে আজও অনেক দেশ, অনেক জাতি আছে যারা এই স্বাধীনতার জন্য যুগ যুগ ধরে লড়ে যাচ্ছে। তারা চায় তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি রেখে যেতে। তাই তো প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত পরাধীন মানুষেরা জীবন দিচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে। তবু থেমে থাকছে না তাদের সংগ্রাম। খোলা আকাশে মুক্ত পাখিদের প্রাণচঞ্চল্য দেখলেই আমরা বুঝতে পারি স্বাধীন জীবন, স্বাধীন জাতি এবং স্বাধীনতা কত বড়ো সম্পদ। এই স্বাধীনতা অর্জন করা কিন্তু মোটেই সহজ কথা নয়।

আমরা আজ মাথা উঁচু করে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, আমরা স্বাধীন জাতি। আমাদের একটি স্বাধীন দেশ আছে। সেই দেশের নাম বাংলাদেশ। একটি স্বতন্ত্র পতাকা আছে– যার সবুজ জমিনের উপর জ্বলজ্বল করছে রক্তস্নাত একটি নতুন সূর্য। এই দেশ এই পতাকা হায়েনাদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পার হয়ে গেছে অনেক বছর। একথা এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এতকাল ধরে কত অত্যাচার সয়েছে, কত জীবন ঝরেছে অকালে। তাদেরই স্বপ্ন আর সংগ্রামের পথ ধরে আমাদের এই স্বাধীনতা।

ভারতবর্ষেরই একটি অঞ্চলের নাম বাংলাদেশ। সুজলা- সুফলা এই দেশ, সারা বিশ্বে সোনার বাংলা নামেও পরিচিত। ফুলের মধু নিতে

যেমন ছুটে আসে মৌমাছি, তেমনি এদেশে লুটপাট করতে এসেছে শক, হূন, তাতার, মারাঠা এবং আরো অনেক বিদেশিরা। মারাঠি সেই অত্যাচারী সৈন্যদের বর্গী নামে জানে এদেশের প্রতিটি শিশুরা। তারা এতটাই অত্যাচারী আর জুলুমবাজ ছিল যে, এখনো মায়েরা তাদের অবাধ্য শিশুদের ঘুমপাড়ানোর সময় 'বর্গী এলো দেশে' ছড়াটা বলে থাকেন।

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো
খাজনার উপায় কী,
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।

দিল্লির মুঘলরা একশ একাশি বছর শাসন ক্ষমতায় থাকলেও এই এলাকাটি বার বারই তাদের হাতছাড়া হয়েছে পরাশক্তির আক্রমণে। ১৬১৫ সালে মুঘল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইংরেজরা ব্যাবসার নামে ঢুকে পরে ভারতবর্ষে। সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ব্যক্তিটির নাম ছিল 'স্যার টমাস রো'। তখন ইংরেজদের পাশাপাশি ফরাসিরাও আসে। ধীরে ধীরে ব্যবসার নামে ইংরেজরা গোটা ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতায় নেওয়ার নীল নকশা তৈরি করতে লাগল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের সাহায্যের নামে শোষণের নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগল।

এভাবেই দিন যেতে যেতে একদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা দিল্লির সিংহাসনে বসেন। নবাবের সাথে অনেকবার ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছে। শেষবার পলাশির প্রান্তরে বাংলার সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে পরাজয় ঘটে নবাবের। সিরাজউদ্দৌলাই ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে টিকে থাকার অভিলাষে ১৭৯৩ সালে জমিদারি প্রথা চালু করে। কিন্তু শেষ ইচ্ছা আর তাদের পূরণ হলো না। পরে ভারতবর্ষের মানুষের দুর্বার সংগ্রামের মুখে শেতাঙ্গরা আর টিকতে না পেরে ১৯৪৭ সালে এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। তবে, যাওয়ার আগে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয় দেশটাকে। সৃষ্টি হয় পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান নামে দুটি দেশ। তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের মারপ্যাঁচে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ১২শ মাইল। রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাও থাকল পশ্চিমাদের হাতে।

তবু সেই প্রথম স্বাধীনতার সুখ ছড়ালো পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে। আশার স্বপ্নে বিভোর হলো প্রতিটি প্রাণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই স্বপ্ন, শাসন আর শোষণের কীটেরা অচিরেই করে ফেলল শত ছিদ্র। লোহার বেরির বদলে এদেশের মানুষ বাঁধা পড়ল ঘষামাজা পিতলের বেরিতে। তবে, এদেশেরই কিছু কিছু মানুষ সব বুঝেও সোনার খাঁচায় বসে কুচ্ছ নেড়ে সুখের গান গাইতে শুরু করল।

পূর্ব-পশ্চিমের মাঝখানে অন্যদেশ, সাগর-মহাসাগর যাই থাকুক না কেন মুসলমান ভাই ভাই। এই সুর তুলে পাকিস্তানের বড়োলাট মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ভাবে গদগদ হয়ে বললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। ফুঁসে উঠল বাংলার মানুষ। কিন্তু মীর জাফরের অনুসারীরা বলল, ঠিক কথাই বলেছেন। এরপর মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় শুরু হলো ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছাত্র- জনতার মিছিলে চালালো গুলি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল– রফিক, সফিক, সালাম, বরকতের মতো অনেক তরতাজা প্রাণ। বাঙালিদের ভাষা আন্দোলনের কথা জানল সারা বিশ্ব। মরিয়া হয়ে উঠল ছাত্র-জনতা। শেষে জয় হলো এদেশের মানুষের। স্থাপিত হলো শহিদমিনার।

তারপর, পশ্চিমাদের শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ চালিয়ে যেতে লাগল আন্দোলন। ন্যায্য দাবির মুখে হঠাৎ একদিন পাকিস্তানের সেনাপতি ফিল্ড মার্সাল আয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারী করে গদি দখল করে বসল। পূর্ব বাংলার মানুষের আন্দোলন কিন্তু থেমে গেল না। বিপাকে পড়ল প্রেসিডেন্ট আয়ুব সরকার। শেষে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আবার সামরিক শাসন জারী করে সেনাপতি ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দলমত নির্বিশেষে এদেশের মানুষ নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ। বাংলার মানুষের মনে আবার স্বপ্ন দানা বাঁধতে লাগল যে, এবার পাকিস্তানের শাসনভার আসছে বাঙালিদের হাতে। পশ্চিমারা আর লুটপাট করতে পারবে না এদেশের সম্পদ। কিন্তু পাকিস্তানিরা ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। ইয়াহিয়া আর ভুট্টো শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার নামে কেবলই ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল নিজেদের মধ্যে। এই ফাঁকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আর গোলাবারুদ আনতে লাগল ওরা। ওদের উদ্দেশ্য বাংলার মানুষকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া।

বাঙালিরা বুঝতে পারল ওদের মনের কথা। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলার নেতা শেখ মুজিব এক বিশাল জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শাল্লাহ।'

এল ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ। ন্যায় এবং সত্যের পথে দেশের সংগ্রামী মানুষ বুকের মধ্যে স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে গভীর ঘুমে শায়িত। নিরস্ত্র সেই ঘুমন্ত শহরবাসীর উপর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেল, মর্টার আর ট্যাংকের গোলার আঘাতে গুঁড়িয়ে দিতে লাগল ঢাকা শহর। আক্রমণ চালালো রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। সেই রাতে বঙ্গবন্ধু হলেন গ্রেফতার। তারপর সান্ধ্য আইন জারী করে নির্বিচারে মারতে লাগল এদেশের মানুষ। এই হত্যাকাণ্ড শুধু ঢাকাতেই নয়, এদেশের বড়ো বড়ো শহরেও চলতে লাগল একইভাবে। দেখতে দেখতে সবগুলো শহরই হয়ে গেল জনমানবহীন এক শ্মশান। শহরের মানুষ সব ফেলে পরিবার-পরিজন নিয়ে পায়ে হেঁটে যে যেদিকে পারল ছুটল।

সেই অবস্থায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার মানুষ যেন এক পরিবারের সদস্য হয়ে উঠল। শহর পালানো ক্ষুধার্ত ক্লান্ত মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল গ্রামের প্রতিটি মানুষ। অভাবের দিনে যার যা জুটেছে তাই তারা মেহমানদের সাথে ভাগ করে খেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি হাজার-হাজার পরিবার শূন্য হাতে অভাবের যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। তবু মানুষের কোনো দুঃখ নেই। হাজার-হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে ভারতে। সারা দেশটা তখন পাক সেনাদের দখলে। দেশে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উধাও। দেশের মানুষ একটা কিছু শুনার আশায় অষ্টপ্রহর রেডিওর পাশে কান পেতে বসে আছে। হঠাৎ শোনা গেল বাংলাদেশ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সাথে সাথে সারা বাংলার মানুষ যেন শিরদাঁড়া শক্ত করে উঠে দাঁড়ালো। মানুষের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ রব ছড়িয়ে পড়ল। যুবকেরা ছুটল ভারতে। দেশের মধ্যেও শুরু হলো যুদ্ধের ট্রেনিং। সীমান্তের ওপাড় থেকে আসতে লাগল আগ্নেয়াস্ত্র। শুরু হলো গেরিলা যুদ্ধ।

দেশের ছাত্র, জনতা ছাড়াও পুলিশ, বাঙালি আর্মি আর তখনকার ই.পি.আর. তারা সবাই অস্ত্র হাতে পালিয়ে এসে যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। তখন

রাজনৈতিক নেতাসহ সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করে দেন। কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীকে করা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান। দেখতে দেখতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার আনাচেকানাচে। গেরিলাদের হাতে মার খেতে থাকে পাকসেনারা। ফলে, প্রতিহিংসায় পাকসেনারা জ্বালিয়ে দিতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম। এর মধ্যেই পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে এদেশের কিছু দালাল। যাদেরকে বলা হয় রাজাকার, আল্‌বদর। এদের কারণেই দেশের মানুষ অত্যাচারে নির্যাতিত হয়েছে অতিমাত্রায়। এদের হাত থেকে বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরা বাঁচতে পারেনি।

বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বের অনেক দেশই এগিয়ে আসে এবং বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। শুধু আমেরিকা এবং চীন স্বাধীনতার বিপক্ষে পাকিস্তানের সাহায্য করতে থাকে। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীনতার পক্ষে আন্তরিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়ায়। তাছাড়া ভারতের সার্বিক সাহায্যের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন দিনরাত শুধু সেল মর্টারের গর্জন। এক সময় ভারত সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানের দুর্বার আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়ে পাকসেনারা। তাদের সবগুলো শক্তিশালী ঘাঁটিই হয়ে যায় ধ্বংস।

পাকিস্তানিরা আর কোনো উপায় না দেখে ১৫ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মোতাবেক ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনাদের উদ্দেশ্যে জেনারেল নিয়াজি ঘোষণা দেন 'হাতিয়ার ডালদো'। ঐদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যৌথ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেলের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন।

তারপরই সারা বাংলার মানুষ বিজয়ের আনন্দে ফেটে পড়ল। বাংলার আকাশে উদয় হলো স্বাধীনতার নতুন সূর্য। পাখিরা আবার ডানা মেলে দিল মুক্ত আকাশে। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেলাম দেশের স্বাধীনতা। মানুষ স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাস টেনে বুক ভরল। পৃথিবীর মানচিত্রে যোগ হলো স্বাধীন বাংলাদেশের নাম। আমরা পেলাম নতুন এক পতাকা– যার সবুজ জমিনের উপর রক্তরাঙা সূর্য। ■

একটি পতাকার গল্প

কাজী তানভীর

দুরন্ত কিশোর ফাহিম। সাত-আট হবে বয়স! বেশ পাকনা, কথাবার্তার ঢং তার দাদার বয়সি! সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে পতাকাওয়ালাকে দেখে দৌড়ে কাছে গিয়ে বলল–

আংকেল বড়ো পতাকাটার দাম কত?

বাবা তুমি এত বড়ো পতাকা দিয়ে কী করবে! আর এত বড়ো পতাকা কেনার টাকা তোমার কাছে থাকার কথাও নয়! এই নাও ছোট্ট পতাকাটা তোমাকে ফ্রিতে দিলাম। নাও..!

আংকেল ছোটো পতাকা আমার আছে। আমার বড়ো পতাকা লাগবে। ঘরের ছাদে উড়াব। বলুন আংকেল কত দাম?

বাবা, বড়ো পতাকাগুলো দু-শো করে বিক্রি করি। তোমার জন্যে দেড়শো রাখতে পারব, না হয় বাবা আমার পোষাবে না!

ঠিক আছে আংকেল। আমার কাছে এখন অত টাকা নেই। আমি জোগাড় করে রাখব। আংকেল ঐ পথের ধারে দেয়াল-ঘেরা বাড়িটা আমাদের। আগামীকাল বাজার থেকে যাওয়ার সময় গেইটে দাঁড়িয়ে ফাহিম বলে ডাক দিলে আমি বের হব। নগদ টাকায় পতাকা কিনে নেব। জানেন আংকেল, কেন নগদে নিতে বলছি?

–না তো বাবা জানি না, বলো.. কেন?

আমার যেটা মনে হয়! আমার পূর্বপুরুষরা তাজা প্রাণ আর রক্ত দিয়ে কিনেছে যেই পতাকা, সেই পতাকা আমার বাকিতে কেনাটা উচিত না, লজ্জা মনে করছি!

–ঠিক বলেছ বাবা। এই পতাকার স্বার্থকতা ক'জনই বা বুঝে। তোমাকে একটা কথা বলি?

–বলেন আংকেল, অনুমতি নেবার কী আছে!

–বাবা, আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী। এই বিজয়ের মাসে চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে পতাকা বিক্রি করি। দেশকে, পতাকাকে খুব ভালোবাসি বলে। এসব শুনে ফাহিম আবেগাপ্লুত হয়ে অপলক পথচলা দেখছে পতাকাওয়ালা আংকেলের! মনে মনে ভাবছে আজব মানুষ তো! এমন স্বদেশপ্রেমী বেঁচে আছে!

পরদিন ফাহিমের অনুরোধ মতে বাজার থেকে যাওয়ার সময় পতাকাওয়ালা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফাহিম বলে ডাক দিলো। কিন্তু ফাহিমের এখনো সেই দেড়শো টাকা জোগাড় হয়নি!

ফাহিম বলল- আংকেল আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এখনো টাকা জোগাড় করতে পারি নাই! আগামীকাল ইনশাআল্লাহ জোগাড় হয়ে যাবে।

–আরে বাবা ফ্রিতে নিয়ে নাও একটাই তো পতাকা। কত টাকা কত পথে অযথা খরচ হয়ে যায়! তুমি আমার ছেলের মতোই! নাও বাবা এটা নাও!!

–না আংকেল আমি ফ্রিতে নেব না! টাকা দিয়েই নেব। ফ্রিতে দিলে রাগ করব আংকেল!

–আচ্ছা বাবা আজ যাই, আগামীকাল আসব।

ধন্যবাদ আংকেল!

জমানো নাশতার টাকা দিয়ে পরের দিন নগদে পতাকা কিনে নিল ফাহিম। পতাকাওয়ালা আংকেলকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় দিলো।

ফাহিম পতাকা কিনতে পেরে খুবই খুশি, দুদিন নাশতা করতে পারিনি তো কী হয়েছে! ফাহিম পতাকা বুকে জড়িয়ে অঝোরে কাঁদল আর মনে মনে বলতে থাকে এই পতাকা কিনতে আমার ছাড়তে হলো নাশতা!

না জানি এই পতাকার জন্য কতজনকে অনাহারে থাকতে হয়েছে! কতই না প্রাণ-রক্ত দিতে হয়েছে! আজকের এই দিনে অনেক অনেক শ্রদ্ধা-ভক্তি সেই মহান মানুষদের প্রতি, যাঁরা নিজের জীবন দিয়ে এই পতাকা অর্জন করে দিয়ে গেছেন। যার সুবাদে আমরা এই পতাকাটা কেনার সুযোগ পেয়েছি।

আমি যদ্দিন বেঁচে থাকব এই পতাকা আমার ঘরের ছাদে উড়বেই! এই পতাকা স্বাধীনতার। এই পতাকা বিজয়ের। এই পতাকা আমার, আমাদের সবার। ■

কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা

রেহমান সামি

চাঁদপুর জেলার সুন্দর একটি গ্রাম 'কৃষ্ণপুর'। গ্রামটি ডাকাতিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। সেই গ্রামের ডানপিটে ছেলে রুবেল। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ১৫ বছর। দশম শ্রেণির ছাত্র সে। তার ছিল চারজন খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাঁচ বন্ধু মিলে একসাথে লেখাপড়া ও খেলাধুলা করত, নদীতে মাছ ধরতে যেত, নৌকা চালাত, পাখি শিকার করত। একসাথে গ্রামের হাটে যেত, বেতারে খবর শুনত, মুরুব্বিদের মুখে দেশের কথা শুনত। এভাবে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানত এবং পাকিস্তান সরকার সম্পর্কেও জেনেছিল।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে পাঁচ বন্ধুর মনে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছে হলো। তারা তাদের বাবা-মাকে এ কথা বলল। কিন্তু বাবা-মা তাদের ওপর খুব রাগ করল। তাই এক রাতে তারা সবাই বাবা-মাকে চিঠি লিখে বাড়ি থেকে পালিয়ে গ্রাম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এক মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিল। ঘাঁটির কমান্ডার তাদেরকে দেখে খুবই অবাক হলো এবং তাদেরকে ফিরে যেতে বলল। কিন্তু তারা খুবই জেদি ছিল। বাড়ি না ফিরে যুদ্ধের ট্রেনিং নিল। তারা ঘাঁটির অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অনেক অপারেশনে অংশ নিল।

যখনই তাদের মন খারাপ হতো, তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনত। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের

মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তাদের সব হতাশা দূর করে দিত। তখন তারা নতুন শক্তিতে চাঙা হয়ে উঠত। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছাড়াও তারা মুক্তির গান শুনত এবং সব কষ্ট ভুলে থাকত। তাদের অনেক অপারেশনের মধ্যে একটি ছিল খুবই উত্তেজনাকর। কারণ এই অপারেশনে তারা বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে লড়েছিল।

নিকটবর্তী গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা ঘাঁটি গেড়েছিল। তাদের দল নেতা খবর নিল পাকিস্তানিরা ১৫/১৬ জন আর তাদের কাছে অনেক অস্ত্র। দল নেতা তাদের পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করল। সে অনুযায়ী এক গভীর রাতে তারা অপারেশনে রওয়ানা হলো। ক্যাম্পের পাশেই ছিল আমবাগান। তারা বাগানে লুকিয়ে ক্যাম্পের দিকে খেয়াল রাখল। তারা দেখল যে ৬/৭ জন পাকিস্তানি সেনা অস্ত্র হাতে ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে আর ক্যাম্পের ভিতরে নীরবতা। তারা বুঝতে পারল বাকি পাকিস্তানি সেনারা ঘুমাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা তখনই পরিকল্পনা করল যে কীভাবে আক্রমণ করবে। সে অনুযায়ী তারা বাগানের একটি গাছে ছোটো একটি পাথর ছুড়ে একটা হালকা আওয়াজ তৈরি করল। ২জন পাকিস্তানি সেনা শব্দ শুনে বাগানের ভিতরে ঢুকল, মুক্তিযোদ্ধারা পিছন থেকে জাপটে ধরে তাদের মুখ চেপে ধরল ও ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাদেরকে মেরে ফেলল। তাদের পোশাক খুলে লাশগুলো লুকিয়ে রাখল এবং পোশাকগুলো তারা গায়ে দিল। একইভাবে তারা বাকি পাকিস্তানি সেনাদেরকে বাগানের ভিতরে এনে মেরে ফেলল। তাদের পোশাক খুলে লাশগুলো লুকিয়ে রাখল এবং ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাদের পোশাক গায়ে দিয়ে ও তাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ক্যাম্পের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জোরে আওয়াজ করল। তাতে ক্যাম্পের ভিতর থেকে বাকি পাকিস্তানি সেনারা ঘুম থেকে জেগে বাহিরে আসতেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলল। এভাবে বুদ্ধি দিয়ে সংখ্যায় অল্প হয়েও পাকিস্তানি সেনাদেরকে হত্যা করল ও অনেক অস্ত্র দখল করল। ■

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

তানজিদ নূর রাফি

[আমার স্কেচের হাতেখড়ি মনোজ বিশ্বাস স্যার-এর হাতে। তাঁর বর্ণনা অনুসারেই এই স্মৃতিচারণ। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।]

ছেচল্লিশ বছর কাটিয়ে এলাম। এখনো মনে পড়ে সেদিনের কথা। ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলাম। আব্বা আমার হাতে ১৫ টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন বাজার আনতে। সেই ১৫ টাকা, পরনে একটি লুঙ্গি, একটি স্যান্ডোগেঞ্জি, পায়ে এক জোড়া স্যান্ডেল- এই ছিল আমার সম্বল। ম্যাট্রিক লেভেলের ছাত্র হিসেবে কাজটি ছিল রীতিমতো ছেলেমানুষি ও বোকামি। তবুও বোকা হওয়ার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো বিপদের পরিণতি ওই লোকের মাথায় আসে না।

আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম ভারতের বীরভূম ক্যাম্পে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে বাঙালিদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হতো। তাদের অধিকাংশই ছিল গ্রামের অসহায়, হাড্ডিসার, আবেগতাড়িত যুবক। ভারতীয় প্রশিক্ষকেরা হিন্দিতেই কমান্ড দিতেন। রাইফেল চালনার ট্রেনিং চলাকালীন বাম চোখ বন্ধ করে রাইফেলের দুটি নটের সাথে টার্গেটকে মিলিয়ে ফায়ার করতে হতো। তখন ভারতীয় সৈন্যরা কমান্ড দিতেন- বাঁয়ে আঁখে বান্ধকারকে ফার্স্ট নটসে সেকেন্ড নট মিলাও ওর ফায়ার কারো।

ফায়ার করার পর রাইফেলের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অনেকে পড়েছিল বিপদে। তবে প্রশিক্ষকেরা আমাদেরকে সবক্ষেত্রেই এসএল আর, থ্রি নট থ্রি রাইফেল এবং এল এমজি, বিস্ফোরকের মধ্যে গ্রেনেড ও প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারের কৌশল আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। সেখানে খাবার বাঙালিদের পছন্দ হওয়ার কথা না। এছাড়া আমাদের ছোটো ছোটো ভুলের জন্য বকুনির অভাব হতো না। ক্রলিং করা ছিল আরো কষ্টকর। এজন্য অনেকেরই কনুই ও হাঁটুর চামড়া পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এক রাতে

আমাদেরকে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। পায়ে হালকা ব্যথা অনুভব করলাম। অন্য পা দিয়ে সেই স্থানের কাদা সরিয়ে ফেললাম। সকালে উঠে পায়ের জমাট রক্ত দেখে কোনো সন্দেহ রইল না যে সেটি মূলত ছিল জোঁক। পায়ের রক্ত শুষে নিয়েছিল। আমরা ছিলাম ৮নং সেক্টরের অধীনে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জেলারেল ম.আ মঞ্জুর। মধুমতী নদীর পাড়। মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়েছে, এই অশান্ত নদী ধরে পাকিস্তানি আর্মিদের একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে। বেশ কিছুক্ষণ পর জাহাজটির দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তারা ছিল আমাদের রেঞ্জের বাহিরে। প্রশিক্ষণের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা সেই দূরত্ব আন্দাজ করতে পারেনি। তারা গুলি ছুড়তে আরম্ভ করলে হানাদারবাহিনী আমাদের অবস্থান টের পেয়ে যায়। জাহাজটি যখন তীরের কাছাকাছি এল তখন আমরা নদীর ঢালের ওপর। কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তানি সৈনিকেরা নদীর ঢালু অংশে পজিশন নিয়ে নিয়েছিল। জীবন বাঁচাতে আমাদেরকে সেদিন পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। বহু মুক্তিযোদ্ধার লাশ আমরা নদীর তীরেই ফেলে এসেছিলাম।

আমারই একজন সহযোদ্ধা শোভনের কাছ থেকে শুনলাম মর্মান্তিক কাহিনি। চারপাশে প্রচণ্ড গোলাগুলি। আশপাশের গাছগুলোর ডালপালা ভেঙে যাচ্ছিল গুলির আঘাতে। মাথার ওপর দিয়ে গুলি যাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ। শোভনের পাশের ছেলেটির কাঁধে গুলি লেগেছিল। পানি পানি বলে সে চিৎকার করছিল। সে-সময় শোভনের সান্ত্বনা 'জাদুরে! এখন তো তোকে পানি দিতে পারব না। তাহলে তুই মরবি আমি ও মরব।'

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যোদ্ধারা অনেক মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। এগুলো তারই উদাহরণ। কিন্তু এ পরাজয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করেই আমরা অর্জন করেছিলাম প্রিয় স্বাধীনতা।

লক্ষীপুর গণহত্যা

দুপুরবেলা। ফুলবাড়িয়া উপজেলা থেকে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি গ্রাম লক্ষীপুর। ছায়াঢাকা এ গ্রামটির স্তব্ধতা হঠাৎ করেই কেটে গেল ভারী মেশিনগান ও মর্টারের আওয়াজে। ছয় থেকে সাতটি ট্রাকে উন্মুক্ত সৈন্যদের হাতের রাইফেল গর্জে উঠেছিল বাঙালি নিধনের নীল নকশা বাস্তবায়নে। বাড়িতে বাড়িতে আর প্রতিটি দোকানে আগুন। অসহায় মানুষ ছুটে চলেছে নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হতবাক, উৎসুক আর ভয়ার্ত রিকশাওয়ালারাও বুঝে উঠতে পারছিল না কোনদিকে যাবে তারা। রিকশাগুলো রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে তারা ট্রাকগুলোকে যাবার রাস্তা করে দিয়েছিল। একইভাবে দাঁড়িয়েছিল পাঞ্জাবি-টুপি পরা মাদ্রাসার হাফেজ শিক্ষার্থীরা। কিন্তু পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞে সেদিন কেউ-ই রক্ষা পায়নি।

ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানিদের একটি সম্মুখ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী -পুরুষ অপহরণ করত। এভাবেই একদিন বাসে করে তারা অপহরণকৃত ১৫-২০ জনকে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছিল। বাসাটিতে ছিল ৩০-৪০ জন সৈন্য। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল অন্য আরেক অঞ্চলে যুদ্ধ শেষে এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের এই অঞ্চলে আসার খবর জানতে পেরে তারা সিদ্ধান্ত নিল, শত্রু-সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে সবাইকে মুক্ত করবে। তবে বন্দুক যুদ্ধ কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না। কারণ তাদের বুলেটের জোগাড় প্রায় শেষ। তাই প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ-ই একমাত্র ভরসা। পরিকল্পনা হলো লক্ষীপুরে ঢোকার ব্রিজটি উলটিয়ে দেওয়া হবে।

ব্রিজে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সেট করার কাজ শেষ। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। পাকিস্তানিদের জিপ ও ট্রাকগুলো ব্রিজে ঢুকতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ব্রিজের বেশিরভাগ অংশ পুড়ে গেল। একইসাথে পেছনে থাকা জিপের সকল সৈন্যকে বের করে আনা হলো। অন্যদিকে অপহৃতদের যার যার মতো আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হলো। এই ঘটনার পরবর্তীতে পাকিস্তানি আর্মি ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। ■

দশম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল।

’৭১-এর শহিদ ক্রিকেটার

সুফিয়ান হায়দার

বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের টাইগাররা এখন দাপটের সাথে ক্রিকেট খেলছে, হারিয়ে দিচ্ছে বিশ্বের সেরা দলগুলোকে। বাংলাদেশের সাকিব-মুস্তাফিজ-মাশরাফি -মুশফিক এখন ভালোবাসার নাম, অনুপ্রেরণার নাম। বিশ্বসেরা খেলোয়াড়ের তালিকায় তারাও থাকেন। বাংলাদেশের সব মানুষের বুকের ভেতর নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করতে শিখিয়েছেন নতুন দিনের এই ক্রিকেটাররা। খুব আনন্দ লাগে, যখন ক্যাপ্টেন মাশরাফি বাংলাদেশ দলের জয় উৎসর্গ করেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের। দেশের সম্মান রাখতে এরা অনেক মানসিক চাপ আর শারীরিক আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মাঠে লড়তে থাকে। দেখে মনে হয়, নতুন বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা বুঝি ওরা!

বন্ধুরা, এতক্ষণ বললাম আনন্দের কথা। দুঃখও মিশে যায় কখনো কখনো, যখন মনে হয় পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশে যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছে, ক্রিকেটাররাও বাদ যায়নি সে তালিকা থেকে। শহিদ ক্রিকেটার জুয়েল, ক্রিকেট সংগঠক মোশতাকও এমনই একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা।

দেশের স্বাধীনতা চাওয়ার অপরাধে শহিদ হয়েছেন যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ, অপমানিত হয়েছেন যে দুই লক্ষ মা-বোন, আমাদের নতুন মুক্তিযোদ্ধারা যখন দেশের জন্য ব্যাট-বল-উইকেটে যুদ্ধ করেন, তখন শান্তি পান শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ক্রিকেটার জুয়েল আর শহিদ ক্রিকেট সংগঠক মোস্তাকের আত্মা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দ এটাই।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ক্রিকেটার জুয়েল আর শহিদ ক্রিকেট সংগঠক মোশতাকের কথা আমরা ভুলিনি, ভুলতে পারি না, ভুলবও না। এই দুই শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুটি স্ট্যান্ড -এর নামকরণ করা হয়েছে শহিদ জুয়েল স্ট্যান্ড এবং শহিদ মুশতাক স্ট্যান্ড।

শহিদ জুয়েলের পুরো নাম আবদুল হালিম চৌধুরী জুয়েল বীরবিক্রম। তিনি ছিলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা ক্র্যাক প্লাটুনের দুর্ধর্ষ সদস্য। ১৯৫০ সালের ১৮ই জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জ জেলার ওয়াজেদ চৌধুরী-ফিরোজা বেগমের সংসারে জন্ম নিয়েছিলেন জুয়েল। তিন ভাই আর চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। স্টাইলিশ ও প্রচণ্ড মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে সারা দেশে ক্রিকেটার জুয়েল ছিলেন একনামে পরিচিত। স্লগ সুইপে তাঁর মতো দক্ষ দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। ডানহাতি স্টাইলিশ ওপেনার আর উইকেট কিপার হিসেবে আজাদ বয়েজ, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং ইস্ট পাকিস্তান প্রভেনসিয়াল দলের হয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতেন। ১৯৬৭ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি একটি কেমিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ক্রিকেট অঙ্গনে একটি প্রিয় নাম ছিল আজাদ বয়েজ ক্লাব। ক্রিকেট-নিবেদিত প্রাণ মুশতাক আহমেদ আর্থিক অনটনে থাকা সত্ত্বেও এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ পরিবার বলতে আজাদ বয়েজকেই বুঝতেন তিনি। আজাদ বয়েজের খেলোয়াড় হিসেবে জুয়েলের সাথে মুশতাক

আহমেদের সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার। ক্রিকেট অঙ্গনে পাকিস্তানিদের অন্যায়ের প্রতি প্রথম প্রতিবাদ করেন জুয়েল। ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্যে পাকিস্তান জাতীয় দলের প্রাথমিক তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে তখন চলছে গণ-অভ্যুত্থানের উত্তপ্ত সংগ্রাম, জুয়েল ঘৃণাভরে সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। একই পথ ধরে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা টেস্টে ব্যাটে 'জয় বাংলা' লিখা স্টিকার লাগিয়ে খেলতে নামেন।

ক্রিকেট অঙ্গনের প্রথম শহিদ হলেন মুশতাক আহমেদ। ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানিদের বুলেট ঝাঁঝরা করে দেয় তার শরীর। ঢাকা ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্যাভিলিয়নের সামনে খোলা আকাশের নিচে দু-দিন পড়েছিল তার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা। ২৭শে মার্চ আরো অনেকের সাথে জুয়েল খুঁজে পান সদাহাস্যোজ্জ্বল শহিদ মুশতাক আহমেদের লাশ। প্রিয় মানুষের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হাতে স্টেনগান তুলে নিতে দেরি করেন না জুয়েল। পিছুটান ছিল মায়ের স্নেহের বাঁধন। মা তো আদরের ছেলেকে কাছ ছাড়া করবেন না। কী করা যায়, ভাবছিলেন। ৩১শে মে তারিখে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে গেলেন। যাওয়ার কদিন আগে মাকে নিজের বাঁধাই করা একটা ছবি দিয়ে বলেছিলেন, আমি যখন থাকব না, এই ছবিতেই আমাকে পাবে।

জুয়েল ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেঘালয়ে যান।

হতে পারতেন তিনি পাকিস্তান দলে ডাক পাওয়া পূর্ব বাংলার প্রথম ক্রিকেটার। স্বপ্ন দেখলেন স্বাধীন বাংলাদেশের হয়ে ক্রিকেট খেলবেন। তিনি পারেননি, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকায় সাজানো জয়রথ চালাচ্ছেন মাশরাফি-সাকিবরা। তাঁর স্বপ্নকে বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে শহিদ হলেন জুয়েল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জুয়েলের বীরত্বের গল্প বলি তোমাদের। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের এক রাতে আনুমানিক আটটার দিকে সবুজ রঙের একটি কার থেকে ক্ষিপ্রগতিতে নামলেন জুয়েল, সাথে চারজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা বদিউজ্জামান, আলম ও পুলু। আরেকজন সামাদ ভাই। তিনি গাড়ি ড্রাইভিংয়ে। চারজনের হাতে স্টেনগান। একজনের

দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিল ডি অলিভেইরা'র সাথে রকিবুল হাসান ও শহিদ জুয়েল।

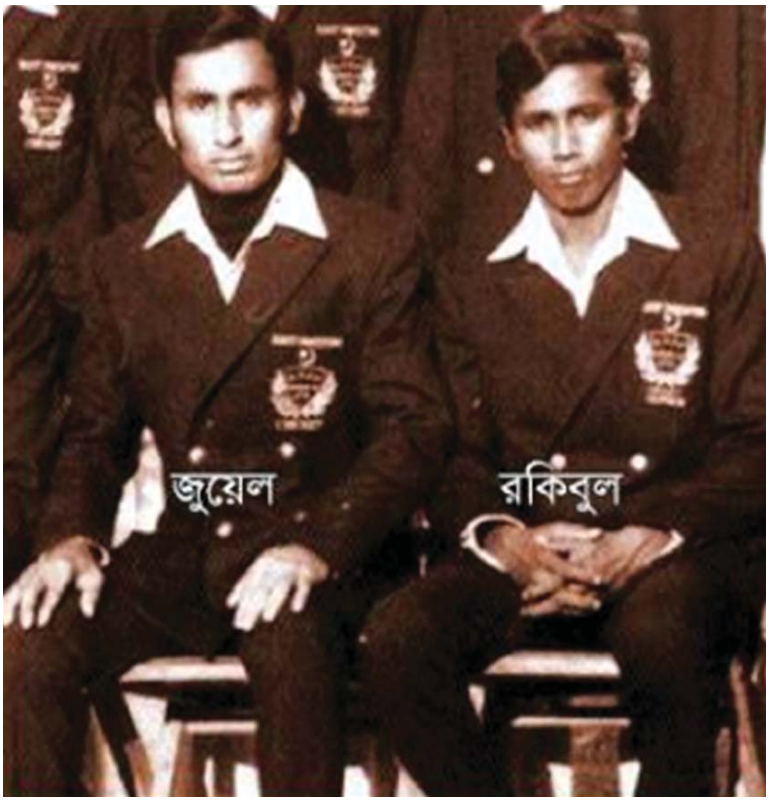

হাতে এসএমজি। ঢাকা মহানগরের ফার্মগেটে ব্যস্ত গলির মুখে এক মিনিটের মধ্যে তাঁরা অবস্থান নিলেন সুবিধাজনক স্থানে। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে গর্জে উঠল সবার অস্ত্র। অদূরে পাকিস্তানি সেনাদের চেকপোস্ট। সেখানে প্রহরারত ১২-১৩ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে গড়িয়ে পড়তে থাকল। দেড়-দুই মিনিট পর মুক্তিযোদ্ধারা উঠে পড়লেন গাড়িতে। শাঁ করে গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল। তিন মিনিটের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন শেষ। শহরের বেশিরভাগ মানুষজন এতে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়। আর পাকিস্তানি সমর্থকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের শেষ দিকে সেখানে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকায় এসে গেরিলা অপারেশন শুরু করেন। ফার্মগেট ছাড়াও এলিফ্যান্ট রোডের পাওয়ার স্টেশন, যাত্রাবাড়ী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে গেরিলা অপারেশনে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেন তিনি। ১৯শে আগস্ট নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে গেরিলা অপারেশনের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পালটা আক্রমণে তিনি আহত হন। এরপর তিনি ঢাকার বড়ো মগবাজার এলাকায় একটি বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসরদের মাধ্যমে তাঁর খবর পেয়ে যায়। ২৯শে আগস্ট ওই বাড়িতে হানা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটক করে। তাঁর ওপর পাকিস্তানি সেনারা অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ৩১শে আগস্ট পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জুয়েলকে মরণোত্তর বীরবিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের সরকারি গেজেট অনুযায়ী তাঁর বীরত্বভূষণ সনদ নম্বর ১৪৮। জুয়েলের প্রকৃত নাম আবদুল হালিম চৌধুরী। জুয়েল তাঁর ডাক নাম।

জুয়েলের (আবদুল হালিম চৌধুরী) পৈতৃক বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার দক্ষিণ পাইকশা গ্রামে। ঢাকা মহানগরের ৬/১ কে এম দাস লেনেও তাঁর বাবার বাড়ি ছিল। জুয়েল অবিবাহিত ছিলেন। তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। দুই ভাইয়ের একজন স্বাধীনতার আগে ও আরেক ভাই ১৯৭৩ সালে মারা গেছেন। বোনেরা বেঁচে আছেন।

প্রতি বছর বিজয় দিবসের দিন প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় শহিদ মুশতাক-জুয়েলকে। ■

শিক্ষক, রাস আল খাইমা বাংলা স্কুল, সংযুক্ত আরব আমিরাত

নিবন্ধ

১৯৭১-এ কেমন ছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অবস্থা

ইমরুল ইউসুফ

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস। চারদিকে জনগণের আনন্দ ধ্বনি। বিজয় উল্লাস। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পরিবার এসব আনন্দের বাইরে। কারণ তাঁরা বন্দি হয়ে আছেন ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের ২৬ নম্বর বাড়িতে। আর বঙ্গবন্ধু বন্দি পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগারে। ২৬শে মার্চ রাত ১.৩০ মিনিটে ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে ওই কারাগারে আটকে রাখে। '৭১-এর ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৬৭ নম্বর বাড়ি ছেড়ে একটি ভাড়া বাসায় ওঠেন। সেই থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়িটি ঘিরে রাখে। ২৫/৩০ জন সশস্ত্র আর্মির পাহারা বসায়। তাঁদের কাউকে ঘরের বাইরে বের হতে দেওয়া হয় না। আজ বাংলার মানুষের আনন্দের দিন। গলা ছেড়ে আনন্দের গান গাওয়ার দিন। আনন্দ মিছিল করার দিন। স্লোগানে স্লোগানে আত্মহারা হওয়ার দিন। কিন্তু তাঁরা ঘরবন্দি ধানমন্ডির ১৮ নম্বরের ওই বাড়িতে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ রাত। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের এই বাড়িতে বসে খাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমার যা বলার ছিল আজকের জনসভায় তা প্রকাশ্যে বলে ফেলেছি। সরকার এখন আমাকে যে-কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারে। সেজন্য আজ থেকে তোমরা প্রতিদিন দুবেলা আমার সঙ্গে একত্রে খাবে।' শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা, শেখ রাসেল, শেখ শহীদ, ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া এবং বেগম মুজিবকে উদ্দেশ্য করে এমনটিই বলেছিলেন। ২৫শে মার্চ রাত থেকে বঙ্গবন্ধু নেতাকর্মীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় ৭ তারিখ থেকে মেনে চলা সেই নিয়ম আর থাকেনি। অন্যরা রাতের খাবার শেষ করলেও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব অপেক্ষায় থাকতেন বঙ্গবন্ধুর জন্য। রাত ৯টার দিকে খেয়ে শেখ কামাল বিদায় নেন। চলে যান গোপন আস্তানায়। রাত ১১টার পরেও বঙ্গবন্ধু খেতে না আসায় শেখ

হাসিনা বাবাকে ডাকতে নিচে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা। বঙ্গবন্ধু মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মা তোকে আমি সারাদিন দেখিনি'।

রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাথে কয়েকজন দেখা করতে আসেন। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নেন তিনি এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। মেয়ের জামাই ওয়াজেদ মিয়াকে ডেকে বললেন, হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে (বেগম মুজিবের বোনের মেয়ে) নিয়ে তাঁর ভাড়া করা নতুন বাসায় ওঠার জন্য। কারণ এই বাড়িতে থাকলে তাদের বিপদ হতে পারে। এজন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ওয়াজেদ মিয়া, বিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের শ্বশুর খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সাহেবের ১২ নম্বর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একই কম্পাউন্ডের তিনটি বাড়ির মাঝের বাড়ির দো তলায় ওঠেন। ১৫ই মার্চ ওই বাড়িতে উঠে নিঃসঙ্গতা বোধ করায় তখনই আবার ফিরে আসেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের ৬৬৭ নম্বর বাড়িতে। ১৬ই মার্চ ধানমন্ডির (পুরাতন) ১৫ নম্বরের (নতুন ৮/এ-১৭৭) বাড়ির নিচতলা ভাড়া নেন এবং ১৭ই মার্চ আসবাবপত্র রেখে আসা হয়। কিন্তু ওই বাড়িতেও বেশিদিন থাকা হয়নি।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ প্রায় সারাক্ষণ ৩২ নম্বর বাড়ির নিচের লাইব্রেরি রুমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান, ড. কামাল হোসেন ও গাজী গোলাম মোস্তফা-সহ অন্যান্য নেতার সঙ্গে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। সন্ধ্যার দিকে যুব ও ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে চলে যান। রাত ১১টার দিকে সর্বশেষ সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের সঙ্গে কথা বলে বঙ্গবন্ধু বাড়ির নিচ থেকে উপরে যান। রাত সোয়া ১১টার দিকে ড. ওয়াজেদ মিয়াকে ডেকে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'যে-কোনো মুহূর্তে পাক সেনারা বাসায় আক্রমণ করতে পারে। আমার এখন অন্যত্র চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কাজেই ওরা আমাকে মারতে চাইলে এই বাড়িতেই মারতে হবে। হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে নিয়ে তুমি ওই বাড়িতে (ধানমন্ডি ১৫ নম্বর রোডের ১৭৭ নম্বর ভাড়া বাড়ি) চলে যাও।'

বঙ্গবন্ধুর এই কথা শেষ না হতেই নিচ থেকে খবর আসে ঝন্টু নামের এক যুবক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এই কথা শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ওর কথাই আমি ভাবছি। ওয়াজেদ, তুমি তাড়াতাড়ি ওকে উপরে নিয়ে এসো।' ড. ওয়াজেদ বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী মহিউদ্দিনসহ ঝন্টুকে নিয়ে উপরে উঠে এলেন। ঝন্টু বঙ্গবন্ধুকে দেখে জড়িয়ে ধরে বললেন, মুজিব ভাই, পাকিস্তান আর্মিরা আপনাকে মারতে আসছে। আপনি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তারা ট্যাংক, কামান ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগেই ঢাকা শহরে ঢোকার জন্য তৈরি হয়েছে।' তারা আর কী পরিকল্পনা করেছে বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলে ঝন্টু জানান, 'তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল), রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ইপিআরবাহিনীর পিলখানাস্থ সদর দফতরে সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে। ঢাকার রাস্তায় যাদের পাবে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাবে। রেডিও, টেলিভিশন কেন্দ্র দখল করবে। টেলিকমিউনিকেশন কেন্দ্র, ফুড গোডাউন দখল করবে।'

বঙ্গবন্ধু এই কথা শুনে ড. ওয়াজেদকে বলেন, এখনই হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে নিয়ে ভাড়া করা ফ্ল্যাটে চলে যেতে। ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া নানা শঙ্কার মধ্য দিয়ে ওই দিন প্রথমে ধানমন্ডির নতুন বাসায় পৌঁছান। এর বিশ মিনিটের মধ্যেই শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, জেলী এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা ওয়াহিদুর রহমান পাগলাসহ বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে ভাড়া নেওয়া সেই বাড়িতে পৌঁছান। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে গোলাগুলি ও কামানের আওয়াজ শুরু হয়। এজন্য আগের রাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কেউ বাড়ির বাইরে বের হতে পারেননি। ফলে বাইরের কোনো খবরও তারা পায়নি। ২৬শে মার্চ রাত ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু এই বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার আগে রাত ১২.৩০ মিনিটে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যা টেলিপ্রিন্টারে সারাদেশে পৌঁছে দেওয়া হয়। ৩২ নম্বর বাড়ির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বিচ্ছিন্নতা শুরু ওই দিন থেকেই। ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় শেখ কামালের এক বন্ধু গোপনে দেয়াল টপকে নতুন সেই বাসায় আসেন

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়ির বারান্দা থেকে জনতার অভিবাদনের জবাবে হাত নাড়ছেন বঙ্গবন্ধু। পিছনে কন্যা শেখ হাসিনা, ২৩শে মার্চ ১৯৭১

এবং জানান, গতরাত আনুমানিক রাত দেড়টার দিকে পাকিস্তানি আর্মি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। বাড়িতে তখন ছিলেন শুধু বেগম মুজিব, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল। বেগম মুজিব তাঁর সঙ্গে থাকা দুই সন্তানকে নিয়ে প্রথমে ওঠেন প্রতিবেশী ড. সামাদ সাহেবের বাড়িতে। পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ওঠেন ধানমন্ডি ১৫ নম্বর রোডে এক আত্মীয়ের বাসায়। কারণ ২৫শে মার্চ রাতে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি আর্মিরা ৩২ নম্বর রোডের এই বাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি করে। বাড়িটি মেরামত করতে দরকার অনেক টাকা। সেই সঙ্গে সময়। এজন্য বেগম মুজিব পরে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের ২৬ নম্বর বাড়িটি ভাড়া নেন। সেখানেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

২৭ তারিখ ভোরে কারফিউ শিথিল হয়। আর তখনই ড. ওয়াজেদ, শেখ হাসিনা ও জেলীকে নিয়ে বেগম মুজিব, জামাল ও রাসেলকে খুঁজতে বের হন। ৩২ নম্বর রোডের ওই বাড়ির সামনে এসে দেখেন বাড়িটি নিস্তব্ধ নিথর দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। কোনো কোলাহল নেই। বাড়িটি পাহারা দিচ্ছে পাকিস্তানি আর্মি। এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের ভূমিকায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন– '২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। এই ঘোষণার সাথে সাথেই পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী তাঁকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায় এবং কারাগারে বন্দি করে রাখে। সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হানাদারবাহিনীর এই দমন পীড়ন ও পোড়ামাটি নীতি এবং গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এরই একটি পর্যায়ে আমরা এক মাসে ১৯ বার জায়গা বদল করেও পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাই নাই, আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার ভাই লে. শেখ জামাল, বোন শেখ রেহানা, ছোটো ভাই শেখ রাসেল, আমি ও আমার স্বামী ড. ওয়াজেদকে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে একটি একতলা বাড়িতে বন্দি করে রাখে।'

১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। শেখ হাসিনা সন্তানসম্ভবা। তাঁকে চেকআপ করার জন্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুফিয়া ওয়াদুদের ক্লিনিকে নেওয়া হয়। ১৫ই জুলাই শেখ হাসিনাকে ডা. ওয়াদুদের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এসময় বেগম মুজিবকে মেয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে হাসপাতালে থাকার কিংবা দেখা করার অনুমতি দেয়নি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এ পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার ছোটো ফুপু খাদিজা খানম লিলি (এটিএম সৈয়দ হোসেনের স্ত্রী) সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে হাসপাতালের কেবিনে থাকতেন। ২৭শে জুলাই রাত ৮টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান জয়-এর জন্ম হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বিকাল ৪টা ১৯ মিনিট। রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্য বিনা শর্তে ভারতীয় সৈন্য এবং মুক্তিবাহিনী নিয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন পূর্বাঞ্চলের যৌথবাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল এ কে নিয়াজী। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপ-সেনাপ্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন এস ফোর্স অধিনায়ক লে. কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ। ২ নম্বর সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর এ টি এম হায়দার এবং টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী।

১৭ই ডিসেম্বরের ঝকঝকে সকাল। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ গার্ডস ইউনিট কোম্পানি কমান্ডার মেজর অশোক কুমার তারা মাত্র তিন জন সৈন্য নিয়ে এ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। ■

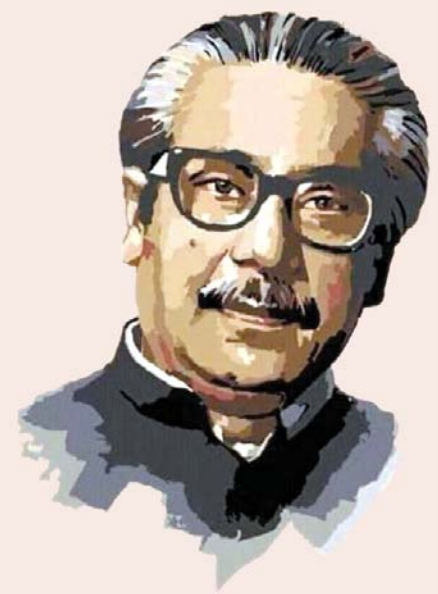

তোমার তুলনা তুমি

মঈনুল হক চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
তোমাকেই মনে পড়ে,
তুমি জাগ্রত আমাদের বুকে
বাংলার ঘরে ঘরে।

তোমার জন্য মুক্ত স্বদেশ
স্বাধীন জন্মভূমি.
তুমি আমাদের জাতির পিতা
তোমার তুলনা তুমি।

তোমার স্মরণে শিল্পীরা গান
গাইবে মধুর সুরে,
তুমি আছ এই বাঙালির বুকে
হারিয়ে যাবে না দূরে।

এদেশের মাটি আকাশ সীমানা
তোমার হাতেই আঁকা,
তুমি বাঙালির গর্বের ধন
হৃদয়ে রয়েছ মাখা।

পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা
বয়ে যাবে যতদিন,
ততদিন এই শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বইবে তোমার ঋণ।

গল্প

এই আমাদের পতাকা

রফিকুর রশীদ

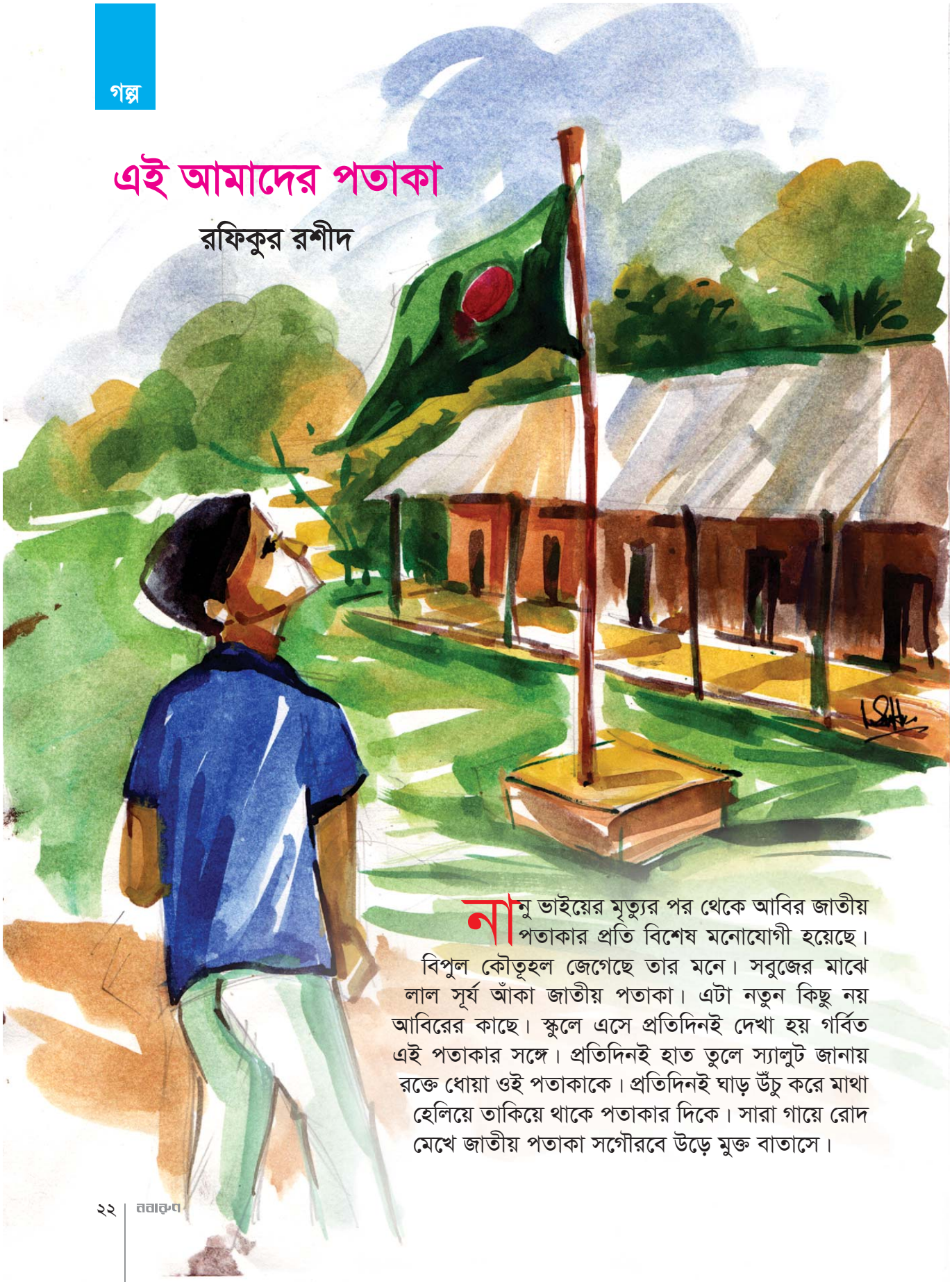

নানু ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে আবির জাতীয় পতাকার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়েছে। বিপুল কৌতূহল জেগেছে তার মনে। সবুজের মাঝে লাল সূর্য আঁকা জাতীয় পতাকা। এটা নতুন কিছু নয় আবিরের কাছে। স্কুলে এসে প্রতিদিনই দেখা হয় গর্বিত এই পতাকার সঙ্গে। প্রতিদিনই হাত তুলে স্যালুট জানায় রক্তে ধোয়া ওই পতাকাকে। প্রতিদিনই ঘাড় উঁচু করে মাথা হেলিয়ে তাকিয়ে থাকে পতাকার দিকে। সারা গায়ে রোদ মেখে জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়ে মুক্ত বাতাসে।

উড়ে উড়ে কত কথা যে বলে, কে জানে! কত গান, কত কবিতা ছড়িয়ে দেয় আকাশে-বাতাসে! প্রতিদিন দেখার পরও আবিরের মনে এসব নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন জাগেনি আগে। গত বছর নানু ভাই চলে যাবার সময় কীভাবে যেন আবিরের চোখে লেপটে থাকা অদৃশ্য এক পর্দা টেনে সরিয়ে দিয়ে যান।

নানু ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে আবিররা যখন মেহেরপুরে পৌঁছে, তখন সূর্য গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। জানাজার মাঠে সবাই অপেক্ষা করছে তাদেরই জন্য। শেষবারের মতো নানু ভাইয়ের মুখ দেখার জন্যে আবিরও আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায় মা-বাবার সঙ্গে। কফিনের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নানু ভাইয়ের বুকের ওপরে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে জাতীয় পতাকা।

আবিরের নানু ভাই মুক্তিযোদ্ধা। যে পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন একাত্তরে, মৃত্যুর পর তাঁকে সেই পতাকায় ঢেকে সম্মানিত করা হয়। টেলিভিশনে এরকম দৃশ্য দেখেছে আবির; গার্ড অব অনার, পুষ্পমাল্য অর্পণ– আরো কত কী! কিন্তু এভাবে এত কাছ থেকে এ দৃশ্য দেখার পর আবিরের ভেতরে ভেতরে কী যে তোলপাড় হয়, ওই পতাকা থেকে সে যেন আর চোখ সরাতেই পারে না। সেদিন সন্ধ্যার পর মন্টু মামাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে আবির। এক সময় দীর্ঘশ্বাস আড়াল করে সে বলে, 'আমাদের জাতীয় পতাকা এত ভালো!'

দুই.

মন্টু মামা আবিরের আপন মামা নয়। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। থাকে হলে। সুযোগ পেলেই আবিরদের বাসায় চলে আসে। আবিরের সঙ্গে রাজ্যের গল্প করে। ভূতের গল্প, সায়েন্স ফিকশন, দেশের ইতিহাস, গ্রামের কথা– আরো নানা কিছু। যতক্ষণ এ বাসায় থাকে, ততক্ষণ বিরামহীন গল্প চলে। আবিরের প্রশ্নেরও শেষ নেই, মন্টু মামার গল্পেরও শেষ নেই। দেখেশুনে একদিন আবিরের মা প্রস্তাব দিয়ে বসে–

'তোর আর হলে গিয়ে কাজ নেই মন্টু। এখানেই থেকে যা।'

এই বাসায় থেকে মন্টু মামা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে, ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর হলে গিয়ে উঠেছে; কিন্তু এতদিন পর এখানে থাকার কথা হচ্ছে কেন সেটা বুঝতে পারে না। তাই সে সোজাসুজি প্রশ্ন করে–

'কেন আপা!'

'তোদের মামা-ভাগনের যে গভীর বন্ধুত্ব!'

আবির এবং মন্টু মামা দুজনেই একটু লজ্জা পায়। আবির ক্লাস সিক্সের ছাত্র। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব! মন্টু মামা লাজুক হেসে বলে–

'দূরে থাকলেও কিন্তু বন্ধুত্ব হয় আপা।'

'সেই জন্যেই তো বলছি– একসঙ্গে থেকে যা'।

'না আপা। হলে না থাকলে পড়ালেখা হবে না।'

আবির সহসা যোগ করে–

'বড়ো হয়ে আমিও হলে থাকব, তাই না মন্টু মামা?'

প্রশ্নের ধরন শুনে আবিরের মা মুখে আঁচল গুঁজে হাসতে হাসতে উঠে যায়। আবির বুঝতে পারে না– কোনো ভুল প্রশ্ন হয়ে গেল নাকি! মন্টু মামা আশ্বস্ত করে, 'নিশ্চয়ই হলে থাকবি। এখন বাসায় থেকে তৈরি হয়ে নে।'

'আচ্ছা মন্টু মামা তুমি কোন হলে থাকো?

'সার্জেন্ট জহুরুল হক হল– নাম শুনেছিস? আগে এর নাম ছিল ইকবাল হল।'

'বাব্বা! তোমাদের হলের নামও বদলে যায় নাকি?

একগাল হেসে মন্টু মামা জানায়, 'বদলাবে না! একাত্তরে এই দেশের নামই তো বদলে গেল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হয়ে গেল বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক কিছুরই নাম বদলেছে। রেডিও পাকিস্তান হলো বাংলাদেশ বেতার, জিন্নাহ্ এভিনিউ হলো বঙ্গবন্ধু এভিনিউ; এই যে তোদের বাসার কাছে আসাদ গেটও আগে ছিল জিন্নাহ্ গেট– এ রকম আরো কত কী!'

এভাবেই মন্টু মামা শুরু করে বদলে যাওয়ার বিস্তারিত গল্প। হয়ত সেদিনের গল্পটা এমন লম্বা হতো না। দোষ আবিরেরই। জিন্নাহ পাকিস্তানের জনক, সেটা

আবিরের জানা, কিন্তু জানে না আসাদ কে। এ প্রশ্ন করতেই শুরু হয় ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের গল্প। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র গল্প। এই মিথ্যে মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবের কথা, আর এক আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের কথা এবং এভাবেই চলে আসে শহিদ আসাদের আত্মত্যাগের কথাও। বলতে বলতে এক সময় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মন্টু মামা। অতটুকুন ছেলে আবিরকেই প্রশ্ন করে– পাকিস্তান ভাঙবে না কেন বল! তারা শাসন-শোষণ-নির্যাতন করবে, আর বাঙালি ন্যায্য অধিকারের কথা বললেই নির্বিচারে গুলি চালাবে?

'একাত্তরের যুদ্ধের আগেই গুলি!' আবিরও বিস্মিত হয়। মন্টু মামা বলে ওঠে, 'তবে আর বলছি কী! সার্জেন্ট জহুরুল হকের বিচার হওয়ার আগেই জেলাখানার মধ্যে চালায় গুলি, মতিউরের বুকে গুলি। কত আর সইবে বাঙালি! সবাই মিলে জোট বাঁধে, সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা স্বাভাবিক পথে ক্ষমতা তো ছাড়ে না।'

খুব মনোযোগী ছাত্রের মতো আবির যোগ করে, 'সেই জন্যই তো মুক্তিযুদ্ধ।'

মন্টু মামা বেশ খুশি হয়। ভাগনের পিঠ চাপড়ে বলে, 'বাহ! কেন মুক্তিযুদ্ধ সেটা তো বেশ বুঝেছিস কিন্তু একটা খবর কি জানিস– ওই যুদ্ধ শুরুর আগেই আমরা জাতীয় পতাকা পেয়েছি, জাতীয় সংগীত পেয়েছি!'

'এ্যাঁ! আগেই এত আয়োজন?'

'হ্যাঁ, তাই। আজ থাক। সে গল্প তোকে অন্যদিন শোনাব।'

তিন.

সেই মন্টু মামা এবার বিজয় দিবসের সকালে বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে আবিরদের বাসায় হাজির। আবিরকে সামনে পেয়ে সোজাসুজি জানায়– তুই হচ্ছিস বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতি, আজকের দিনে তোদের বাসায় পতাকা না উড়লে চলে!

আবির ঠিক মনে করতে পারে না, এ বাসায় কখনো পতাকা উড়তে দেখেছে কিনা। পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের তিনতলায় তারা থাকে। ছাদের ওপরে পতাকা তোলা হয় কিনা সে জানে না। মন্টু মামার হাত থেকে খপ করে পতাকাটা নিয়ে সে বলে, 'তুমি বসো মামা, আমি এক্ষুনি আসছি।'

আবির দ্রুত পায়ে ছাদে গিয়ে পতাকা উড়িয়ে নেমে আসতেই মন্টু মামা বলে–

'দায়িত্ব বেড়ে গেল কিন্তু!'

'কী রকম?'

'সূর্য ডোবার আগেই পতাকা নামিয়ে আনতে হবে কিন্তু!'

'না হলে কী হবে?'

'হবে না হয়ত কিছুই। কিন্তু শাস্তি হওয়ার আইন আছে। শাস্তি হতেও পারে।'

আবির ফিক করে হেসে বলে, 'পতাকারও আইন-কানুন!'

'পতাকাকে কী মনে করো তুমি?' মন্টু মামা রেগে গেলে আবিরকে তুই না বলে 'তুমি' বলে। আঙুল নাড়িয়ে ব্যাখ্যা দেয়– 'জাতীয় পতাকা হচ্ছে জাতীয় ঐতিহ্য ও চেতনার প্রতীক, জাতীয় জীবনের বিমূর্ত আয়না। পতাকার অপমান মানে গোটা জাতির অসম্মান। সেই পতাকা ব্যবহারের নিয়মনীতি আর আইনকানুন থাকবে না?'

এবার একটু তোয়াজ করার ভঙ্গিতে বলে আবির–

'রাগ করো না মন্টু মামা, সেই ব্যাপারটাই বুঝিয়ে বলো না।'

'না না, রাগের কথা হচ্ছে না, কথাটা হচ্ছে জানা-বোঝার। আমাদের পতাকা ভালো করে দেখেছিস কখনো?'

অম্লান বদনে জানায় আবির, 'হ্যাঁ দেখেছি। সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত।'

'লাল বৃত্ত নয়রে বোকা, গোলাকার-উদীয়মান সূর্য, লাল টকটকে!' মন্টু মামা ফুরফুরে মেজাজে পতাকার বিবরণ শুরু করে– 'আমাদের বর্তমান পতাকায় আছে ওই দুটি রং, সবুজ আর লাল। সবুজ হচ্ছে তারুণ্য-সজীবতা এবং প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রতীক। তাছাড়া গোটা

দেশটাই তো সবুজের দেশ। অনাবিল সবুজ এই দেশের বুকে জেগে উঠছে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। যেন লাখো শহিদের রক্তমাখা ওই সূর্য। সূর্যের কাজ কী? আঁধার তাড়ানো আলো ছড়ানো। বাঙালির জীবনে পরাধীনতার অন্ধকার সরিয়ে মুক্তির আলো দিয়েছে ওই সূর্য...'

মন্টু মামার দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে হঠাৎ হাত তুলে বাধা দেয় আবির–

'দাঁড়াও দাঁড়াও, শুরুতেই তুমি বর্তমান পতাকা বললে কেন?'

'ভেরি গুড। ' মন্টু মামা আনন্দের সঙ্গে বলে, 'এটা তোর কানে বেধেছে তাহলে। '

'হ্যাঁ। আমাদের কি অন্য পতাকা ছিল কখনো?'

'তা ছিলই তো। ঠিক অন্য পতাকা নয়। এখনকার এই পতাকার মতোই, তবে ওই লাল সূর্যের মাঝে ছিল সোনালি রঙে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র। '

আবিরের প্রবল কৌতূহল 'ওমা, তাই নাকি! কখন ছিল সেই পতাকা?'

'তাহলে তো তোকে জাতীয় পতাকার গোড়ার কথা বলতে হয়। বেশ পেছনের কথা। '

কথা সেই একাত্তরেরই। দেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়নি। স্বাধীনতার ঘোষণাও হয়নি। তবে দেশের মানুষ বুঝে গেছে, ভোটে পাস করলেও পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না। কাজেই আর নয় পাকিস্তান, বাঙালি চায় স্বাধীন বাংলাদেশ। ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হঠাৎ করেই বহু প্রত্যাশিত জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে দিলে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরদিন ২রা মার্চ ছাত্রলীগের ডাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় লাখো ছাত্র-জনতার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে তখনকার ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা তুলে ধরেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই

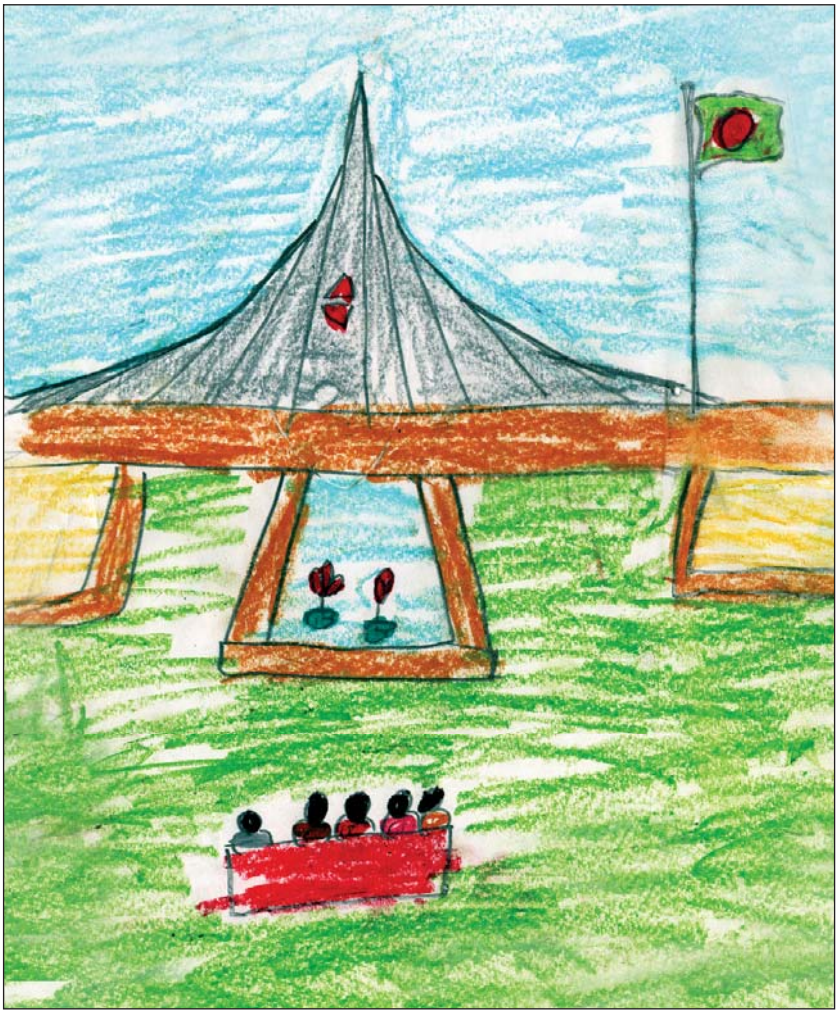

দেবজ্যোতি রায়, দ্বিতীয় শ্রেণি, ড্যাফোডিল কিন্ডার গার্টেন

পতাকা উত্তোলন করা হয় ২৩শে মার্চ পল্টনের জনসভায়। ওই প্রথম পতাকার ডিজাইন করেন শিল্পী শিবনারায়ণ দাশ। একাত্তরের মার্চ মাস জুড়ে এ দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এমনকি ঘরে ঘরে শোভা পায় এই নতুন পতাকা। ওই পতাকা সামনে ধরেই বীর বাঙালি যুদ্ধ করে, অর্জন করে বিজয়।

এত কথা জানার পর আবির যেন আবারো চমকে ওঠে, 'কী বলছ মন্টু মামা! সেই পতাকাও বদলাতে হলো!'

হ্যাঁ, প্রথম পতাকা তৈরি হয়েছিল আবেগ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সঠিক মাপজোক ছিল না। তাই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পতাকার সঠিক আকৃতি, রং ও নমুনা, ব্যবহারবিধি সবকিছু স্থির করে দেয়। আগের পতাকার মূল কাঠামো ঠিক রেখে পরের পতাকার ডিজাইন করেন শিল্পী কামরুল হাসান। সোনালি রঙের মানচিত্রটি লাল বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়। কারু মানচিত্রের সেই ভূখণ্ড এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পতাকায় নয়, বাস্তবেই পাওয়া হয়ে গেছে। কাজেই পতাকায় মানচিত্রের কী প্রয়োজন?

'আচ্ছা মন্টু মামা, ছোটো-বড়ো নানান সাইজের পতাকা হয় কেন?'

'নানানরকম প্রয়োজনে ব্যবহার হয় যে!' মন্টু মামা বুঝিয়ে বলে 'গাড়ির পতাকা আর বাড়ির পতাকা তো সমান হবে না! স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতের পতাকা আবার অন্য আকৃতির। বড়ো হলে নিশ্চয়ই বিস্তারিত জানবি। এখন এইটুকু বলি– আমাদের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত হচ্ছে ১০:৬। মানে দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট। এ সবই সংবিধানে স্থির করা আছে। এগুলো অমান্য করলে শুধু পতাকা নয় দেশের অপমান করা হয়। সেটা খুব বড়ো অপরাধও বটে।' একটু থেমে মন্টু মামা আবার যোগ করে, 'জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রদানের সময় সবাইকে নীরবে উঠে দাঁড়াতে হয় কেন জানিস?' নিজেই জবাব দেয়, 'পতাকার প্রতি সম্মান জানাতে, শ্রদ্ধা জানাতে।'

হঠাৎ আবির বলে, 'খেলার মাঠে কী রকম পতাকার ছড়াছড়ি বলো তো মামা!' 'সেও হচ্ছে দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই।' মন্টু মামা হঠাৎ ব্রেক কষার মতো করে বলে– 'শোন আবির, পতাকা নিয়ে তো অনেক কথা হলো, আয় এবার আমরা দু'জনে রবীন্দ্রনাথের গান গাই।' এই পর্যন্ত বলে মন্টু মামা নিজেই গাইতে শুরু করে– 'তোমারও পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি...।' ■

বঙ্গবন্ধুর উক্তি

আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড়ো দূর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালোবাসি।

আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।

জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই কথা মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সাথে আর কিছুই নিয়ে যাব না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের উপর অত্যাচার করবেন?

মহান বিজয় দিবস

মুহা. রাকিবুল ইসলাম

ম- মহান বিজয় নয় পরাজয়
বীর বাঙালি জাতি
হা- হাসনাহেনা রক্তে কেনা
সুবাস ঘ্রাণে মাতি।
ন- নবীন প্রবীণ বীর বাঙালি
একটি ভাষার তরে
বি- বিজয় মানে সেই ইতিহাস
কত রক্ত ঝরে।
জয়- জয়-পরাজয় বরণ করে
বুকে বেঁধে আশা
দি- দিবস যামী ধন্য আমি
পেয়ে বাংলা ভাষা।
ব- বীরের বেশে আনল শেষে
স্বাধীন প্রিয় দেশ
স- সকল সময় শ্রদ্ধা জানায়
বেশ বাঙালি বেশ।

বিজয়

মো. ইহসান আহমেদ

লাল-সবুজ পতাকার জন্য
যাঁরা জীবন করেছে দান
আমরা ভুলব না কোনোদিন
তাঁদের অবদান।

যুদ্ধ করে জীবন দিয়ে
বিজয় এনেছে যারা
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান
ইতিহাসে অমর তারা।

সপ্তম শ্রেণি, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়

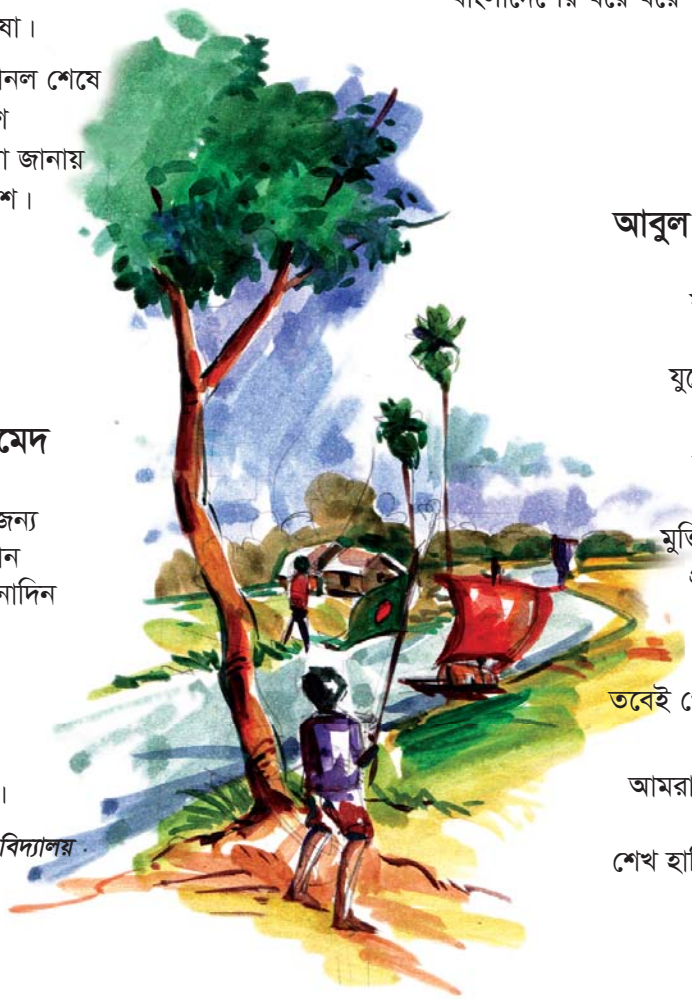

বিজয়ের দিন

শাহীন রায়হান

কিচিরমিচির পাখি ডাকে হাওয়ায় দোলে ফুল
ছোট্ট খুকুর মিষ্টি গালে দোল খেয়ে যায় চুল
পথ সেজেছে মাঠ সেজেছে লাল-সবুজে সব
প্রজাপতির রঙিন ডানায় খুশির কলরব।

বাবা বসে জায়নামাজে মায়ের মুখে হাসি
সবার মনে প্রশান্তি আজ রাখাল বাঁজায় বাঁশি
আকাশ জুড়ে পাখি উড়ে কেউ পাতে না ফাঁদ
উড়ে উড়ে নিচ্ছে ওরা স্বাধীনতার স্বাদ।

ছেলে-বুড়ো কেউ থেমে নেই করছে ছুটোছুটি
সবুজ ঘাসে গঙ্গাফড়িং করছে লুটোপুটি
আউলবাউল গাইছে সবাই বাজছে খুশির বীণ
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ বিজয়ের দিন।

বিজয় এনে

আবুল হোসেন আজাদ

যুদ্ধে গেছি একাত্তরে
মাতৃভূমির জন্য,
যুদ্ধে লড়ে বিজয় এনে
আমরা যে অনন্য।

বঙ্গবন্ধু যখন দিলেন
স্বাধীনতার ডাক,
মুক্তিযুদ্ধে শামিল হলাম
প্রাণ যদি যায় যাক।

বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাতে
বীরবিক্রমে লড়ে,
তবেই পেলাম আমরা বিজয়
দীর্ঘ ন'মাস পরে।

আমরা এখন স্বাধীন জাতি
বীর বাঙালির দেশ,
শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ
সুখী বাংলাদেশ।

গল্প

বাল্যবন্ধু

জোহরা শিউলী

‘তুমি আজকে কার পাশে বসেছিলে?’

‘নাজিবা’ - আইসক্রিমে কামড় বসিয়ে দিয়ে জবাব দেয় পৃথ্বী।

‘নাজিবার সঙ্গে বসতে তোমার ভালো লাগে?’ নানার এই প্রশ্নে উপর- নিচ মাথা নাড়ায় সে। মুখে আইসক্রিম। বেশি কথা বলা যাবে না।

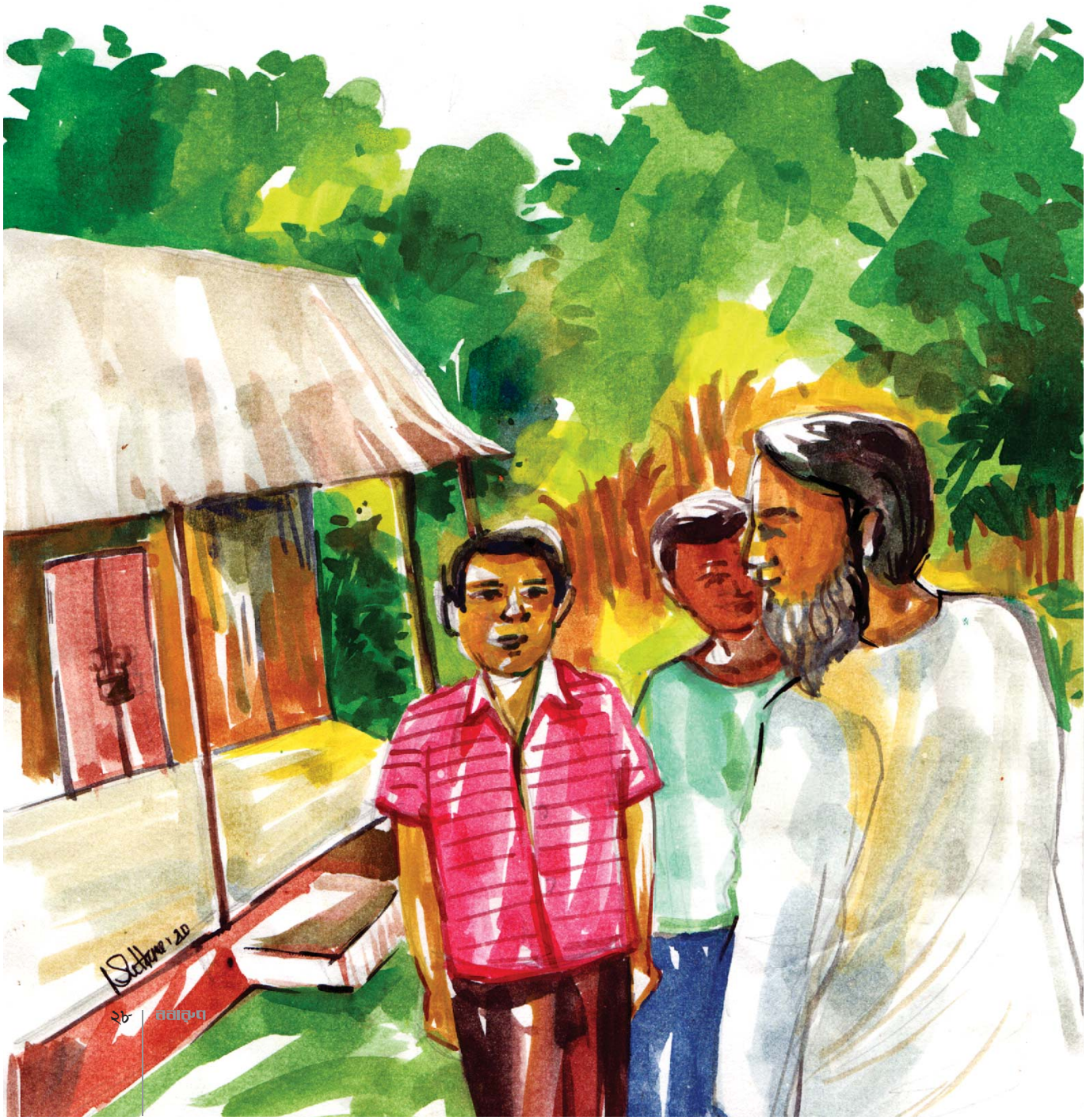

'আর কারো সঙ্গে বসতে, খেলাধুলা করতে ভালো লাগে না?' - আবারো নানার প্রশ্ন। এবারো দুইপাশে মাথা নাড়ায় সে। মানে- না। মুখে তো আইসক্রিম। এত কথা কীভাবে বলবে?

নানা ভাই বুঝতে পারে। মুচকি হেসে তাই নাতির হাতটা আরেকটু শক্ত করে ধরে। এবার রাস্তা পার হবার পালা। মাঝে মাঝে শক্ত করে হাত ধরে, নয়তো কোলে করে নিয়ে রাস্তা পার হন তিনি। ঢাকার রাস্তার যা অবস্থা। ভয়-ই পান এই ষাটোর্ধ্ব নানা। গলির মাথায় স্কুল। হেঁটে হেঁটে নাতিকে স্কুল থেকে আনতে যান তিনি। স্কুল থেকে ফেরার পথে পৃথ্বীর মুখে খই ফোটে। কথার পর কথা। নানা ভাই পাখির কিচিরমিচিরের মতো কথাও খুব উপভোগ করেন। কিন্তু আজ পৃথ্বীকে আইসক্রিমে পেয়েছে। তাই কথা একটু কম বলছে। মাথা নাড়িয়ে, হু - হা করে কথার জবাব দিচ্ছে।

বাসায় ফিরে আবার নাতির কিচিরমিচির।

টিভিতে চলছে টম অ্যান্ড জেরি।

নাতির সঙ্গে কার্টুন দেখতেও নানা ভাইয়ের মজা। টম অ্যান্ড জেরির নানা দুষ্টুমিতে হেসে কুটিকুটি হোন দুজনেই।

'শোনো নানা ভাই...' হঠাৎ মনে পড়েছে এমন করে জানাল পৃথ্বী।

'আমি শুধু নাজিবার সঙ্গেই বসি না। মাঝে মাঝে মাহি, শ্রেয়ান, আম্বিয়া ওদের সঙ্গেও বসি। একসঙ্গে মজা করে খেলি। ওরাও আমার বাল্যবন্ধু।' - একনিশ্বাসে বলে যায় কথাগুলো। একটু দম নিয়ে পরের প্রশ্ন।

'আচ্ছা আমার এত বাল্যবন্ধু। বাবা-মায়েরও অনেক বাল্যবন্ধু। তোমার কোনো বাল্যবন্ধু নেই? স্কুলে তুমি কার পাশে বসতা?' চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা।

'আমারও অনেক বাল্যবন্ধু আছে। তবে সবাই ময়মনসিংহে। আর স্কুলে কার পাশে বসতাম? জানো, আমারও না তোমার নাজিবার মতো খুব প্রিয় একজন বাল্যবন্ধু ছিল। আমি সারাক্ষণ ওর সঙ্গে স্কুলে বসতাম। একসঙ্গে খেলতাম। কী যে মজা হতো...'- এবার গল্প পেয়ে বসে নানা ভাইকেও।

'জানো আমার সেই বাল্যবন্ধুটার নাম কী? ওর নাম হচ্ছে বাদল। দুষ্টুমি করে ওকে আমরা বাদলা বলে ডাকতাম। ও স্কুলে না আসলে আমার ভালো-ই লাগত না। আমরা একসঙ্গে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতাম। আবার স্কুলে যাবার সময় ও আমাকে নিয়ে যেত।'

'তোমরা তখন কীভাবে একা একা স্কুলে যেতে? আমাদের ভ্যানের মতো করে?'

'আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন বাবা-মায়ের এত নজরদারি ছিল না। আর আমরা গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করতাম। গ্রামের মাটির রাস্তা দিয়ে সব বাল্যবন্ধুরা মিলে একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতাম। আর জানো যাওয়ার সময় কারো গাছে কোনো ফল ঝুলে থাকলে সেগুলো পেড়ে পেড়ে খেয়ে ফেলতাম। বরই, আম এগুলো আমাদের যন্ত্রণায় কেউ গাছে রাখতে পারত না।'

হো হো করে হেসে উঠেন নানা। পুরনো দিনের কথা বলতে গিয়ে কেমন একটা সুখী সুখী মুখ। 'মাঝে মাঝে বাদল আমাদের বাড়িতে চলে আসত। আমরা সারাদিন একসঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করতাম। পুকুরে সাঁতার কাটতাম। শুধু যে দুষ্টুমি করতাম তা কিন্তু নয়। আমরা পড়াশোনাও করতাম একসঙ্গে। ক্লাসে ওর রোল ছিল এক। আর আমার দুই। তাই বাড়ির সবার মতো স্কুলের শিক্ষকরাও আমাদের আদর করতেন।'

শৈশব-কৈশোরের সব স্মৃতি যেন চোখের সামনে ভাসছে নানার। আর আট বছরের পৃথ্বীও নানার এত মজার মজার ঘটনা চোখ বড়ো বড়ো করে শুনছে।

'নানা ভাই, তুমি এরপর ঢাকায় আসলে তোমার ওই বাল্যবন্ধুটাকে নিয়ে আসবে? এমনও হতে পারে আমরা যখন ময়মনসিংহে যাব তখন তুমি ময়মনসিংহের বাসায় তোমার বাদল বাল্যবন্ধুকে নিয়ে আসবে।'

'সেটা তো আর হবে না রে...'- দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি।

'কেন হবে না? উনি কি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন?

'জানি না যে নানা ভাই। আমরা যখন একটু বড়ো, এই যেমন তুমি এখন ক্লাস ওয়ানে তেমনি আমরা ক্লাস এইটে। তখন থেকে তাকে আমি দেখি না। একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি সে আর আসে না। পর পর তিনদিন

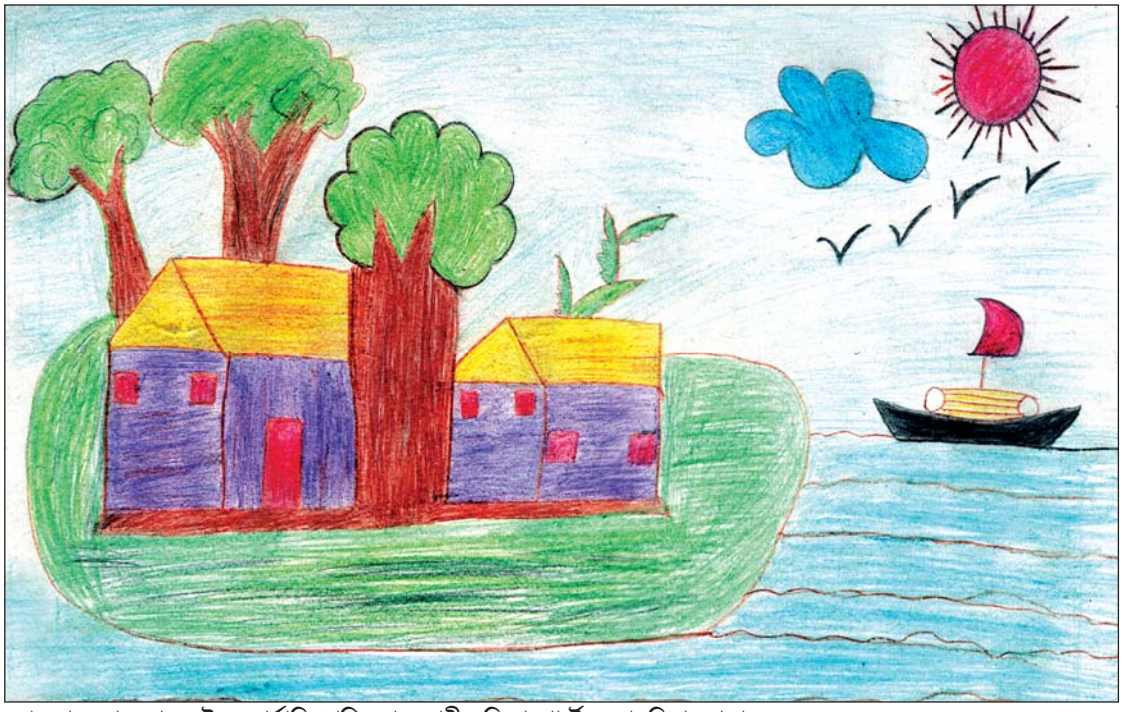

মো. আবদুল্লাহ আল মুইয়্য, নার্সারি শ্রেণি, আল কারীম কিন্ডারগার্টেন, আশুলিয়া, সাভার।

স্কুলে আসে না। আমার সে কী মন খারাপ। আমি আর আমার দুই বাল্যবন্ধু মিলে বাদলদের বাড়িতে যাই ওর খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখি ওরা কেউ নেই বাড়িতে। পুরো বাড়ি খালি পড়ে আছে। '

আল্লাহ! উনারা বাসা ছেড়ে দিবে, তোমাকে আগে জানাবে না?

নানা ভাই, 'ওরা তো আর জানত না ওদের বাড়ি ছাড়তে হবে। দেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ।'

'ওই যে টিভিতে যে যুদ্ধ দেখায়? যে যুদ্ধের পর আমাদের দেশ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যে যুদ্ধতে জিতেছেন?'

ওরে নানা ভাই তুমি তো দেখি মুক্তিযুদ্ধের কথা জানো-ই।

হুম বাবা আমাকে বলেছে। আচ্ছা যুদ্ধ হওয়ার সময় কেন বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়?

'ওরা তো ছাড়তে চায়নি। এই দেশে থাকলে তো ওদের মেরে ফেলত। তাই ওরা লুকিয়ে চলে গেছে কলকাতায়। এদেশে হিন্দুদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছিল। বাদলরা তো হিন্দু ছিল। তাই অন্যান্য আরো অনেক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে তারা সবাই কলকাতায় চলে যায়। আমার আর কখনো দেখা হয়নি বাদলের সঙ্গে। ভাবতাম যুদ্ধ শেষ হবার পর এই দেশে চলে আসবে। কিন্তু আর আসেনি। ওর জন্য এখনো আমার খুব খারাপ লাগে। মনে মনে খুব মিস করি। '

কথা শেষ হয় নানা ভাইয়ের। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। কেমন যেন চুপ করে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

চোখ টলটল করে পৃথ্বী বলে- 'কেন এমন যুদ্ধ হলো? তুমি তোমার বাল্যবন্ধুটাকে হারিয়ে ফেললে। নানা ভাই, আবার কী যুদ্ধ হবে? নাজিবাকে আমি হারিয়ে ফেলব?'

'আরে নাহ...আর কোনো যুদ্ধ নয়। এখন আমরা স্বাধীন দেশেই আছি। বঙ্গবন্ধু তো আমাদের দেশ স্বাধীন করেই দিয়েছেন। কত কত মানুষ শহিদ হলেন। সবার রক্তের বিনিময়ে আমরা এই দেশ পেয়েছি। আর কোনো যুদ্ধ নয়। তুমি আর নাজিবা একসঙ্গে-ই থাকবে। ' আশ্বাস দিয়ে বুকে চেপে ধরেন পৃথ্বীকে নানা ভাই। ■

মামার গল্প বলা

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অমি, প্রমি, ইভান রুহানের স্কুল বন্ধ। ছুটির দিন এলেই ওরা আমার গল্প শুনতে চায়। আমাকে কাছে পেতে চায়। আমি হলাম ওদের প্রিয় গল্প মামা। ওদের বাড়িতে না গেলে বার বার ফোন করবে। ওরা জানে, ছুটির দিনগুলোতে আমি ফ্রি থাকি। আমারও মনটা ছটফট করে ওদেরকে কাছে পেতে। এই চারজন মিষ্টি ভাগনা-ভাগনি আমার খুব প্রিয়। খুব আদরের। ছুটির দিনগুলোতে ওদেরকে পাশে পেলে আমারও আড্ডা জমে খুব। ইদানীং ভয় পাই। ভয় পাই ওদের বাড়িতে যেতে। নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। ওদের কাছে গেলেই বিপদে পড়তে হয়। আমাকে কাছে পেলেই এই দুষ্টুগুলো গল্প শোনার বায়না ধরবে। যতক্ষণ না গল্প শুনিয়ে ওদের পেট ভরাতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই।

নতুন নতুন গল্প শোনাতে গিয়ে আমাকে কিছু বইপত্র ঘাটতে হয়। পুরাতন ও দুর্লভ পত্রপত্রিকা খুঁজতে হয়। কী গল্প? কোন গল্প শুনাবো? সেজন্য কিছু স্টাডি করতে হয়। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে চার-পাঁচটা আনকমন গল্প আমাকে মুখস্থ করতে হয়। সাবধানও থাকতে হয়। গল্পগুলো কোথাও ওরা শুনেছে কি না। কোথাও পড়েছে কি না। ওদের শোনা বা জানা গল্প হলে ধরা পড়ার ভয় থাকে। ধরা পড়লে লজ্জা পাব। ওরা জানে, আমি নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে উপস্থিত গল্প শুনাই। উপস্থিত মজার মজার গল্প বলতে পারি। এর জন্য অবশ্য আমিই দায়ী। প্রথম প্রথম আমিই বাহাদুরি দেখিয়ে ওদেরকে বলেছি, যে-কোনো সময়, যে-কোনো মুহূর্তেই উপস্থিত থেকে মজার মজার গল্প তৈরি করতে পারি। সেই থেকে ওরা আমার গল্পের ভক্ত হয়ে যায়। আমিও ওদের কাছে দিন দিন প্রিয় গল্প মামা হয়ে উঠি। এই দুষ্টুগুলো গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্ন করা ভালো। মেধাবী বাচ্চারাই প্রশ্ন করে বেশি। কিছু না বুঝলেই প্রশ্ন করবে। যাদের জানার আগ্রহ বেশি। তারাই প্রশ্ন করে বেশি। আমার প্রিয় ভাগনা-ভাগনি চারজনও কিছু জানার বা শেখার ক্ষেত্রে খুবই আগ্রহী। খুবই মনোযোগী। বিশেষ করে রুহান। ওকে ফাঁকি দেওয়া খুবই কষ্ট। রুহানটা গল্পের মাঝে একটু ফাঁক পেলেই প্রশ্ন

করে বসে। আটকে গেলেই ওদের কাছে লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

আজ মনে মনে স্থির করে রেখেছি, ওদের বাড়িতে যাব না। এই সপ্তাহে কোনো গল্প মুখস্থ করা হয়নি। জানি, আজ ওরা আমাকে ফোন দিবে। সকাল থেকেই ফোন আসতে শুরু করেছে। আমি একবারও ধরিনি। মা বার বার ফোন ধরছেন। মায়ের বকা খেয়ে আমাকে ফোন ধরতেই হলো। ওদের সাথে কথা বলে আর নিজেকে আড়াল রাখতে পারলাম না।

আজ জুম্মার নামাজ পড়ে ওদের বাড়িতে গেলাম। দুপুরের খাবার সময়। ঘরে ঢুকেই দেখলাম, সবাই একসাথে বসে মজা করে খাচ্ছে। আমাকে দেখেই সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। সবাই বলল, মামা আমরা আজ হরিণের মাংস খাচ্ছি। তুমিও বসে পরো মামা। আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না। এমন দুর্লভ মাংস না খেলে কি হয়?

খেতে খেতে বললাম, তোমরা হরিণের মাংস কোথায় পেলে? রুহান বলল, আব্বুর এক বন্ধু দিয়েছেন মামা। বললাম, হরিণের মাংস খেতে একটু টক লাগছে না? সবাই বলল, জি মামা। টক লাগছে কেন? বললাম, আমি জানি কেন টক লাগছে। আমি দেখেছি হরিণ কী খায়? সবাই চমকে উঠে বলল, আপনি দেখেছেন? কোথায়? কীভাবে দেখলেন মামা? আমি আরেকটু বাহাদুরি দেখিয়ে বললাম, জীবনে কত হরিণ শিকার করেছি। কত মাংস খেয়েছি। আজ মনে পড়ে গেল আমার। আমার কথা শুনে সবাই বলে উঠল, খাওয়া শেষে আজ আপনার হরিণ শিকারের গল্প শুনব মামা। আমি রীতিমতো বিপদে পড়ে গেলাম। ভাবলাম এই কথাটা এই বিচ্ছুদের বলতে গেলাম কেন? খুব ধীরে ধীরে খেলাম। মনে মনে ভাবলাম কীভাবে হরিণ শিকারের গল্প আজ এদেরকে শুনাই? খাওয়া থেকে উঠে টয়লেটে ঢুকলাম। টয়লেটে ঢুকার মূল কারণ হলো কিছু সময় বসে হরিণ শিকারের গল্পটা মনে মনে সাজাবো।

টয়লেটে বসে কোনোরকম একটা গল্প মনে মনে সাজালাম। বের হওয়ামাত্রই আমার একহাতে ধরল অমি-প্রমি। অন্যহাতে ইভান-রুহান। চারজনে টেনে নিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় বসালো। সবাই একসাথে বায়না ধরল, হরিণ শিকারের গল্প শুনবে বলে।

আমি অনেকটা দুরুদুরু বুকে, মুখে কিছুটা হাসি ফুটানোর চেষ্টা করে, কিছু ঢং-এর অভিনয় করা শুরু করলাম। বললাম, শুনো সোনামনিরা, একবার শখ হলো সুন্দরবনে গিয়ে হরিণ শিকার করতে। ব্যাস আর দেরি নয়। একটা ধারাল ছোরা আর বন্দুক নিয়ে চলে গেলাম খুলনায়। খুলনায় বলতেই রুহান জানতে চাইল, খুলনায় কেন মামা? অমি আর প্রমি বলল, এই ভাইয়া থাম তো। মামাকে বলতে দে। আমি বললাম, ভালো প্রশ্ন করেছ। সুন্দরবনের নিকটতম জেলা হচ্ছে খুলনা আর সাতক্ষীরা। তাই আমাকে আগে খুলনায় যেতে হয়েছে। সেখানে এক রাত হোটেলে থাকলাম। পরেরদিন সোজা সুন্দরবনে চলে গেলাম। সুন্দবনে ঘুরে ঘুরে সময় চলে যাচ্ছে। এর মাঝে বাঘ-ভাল্লুক-অজগর অনেক দেখলাম। এবার ইভান বলল, বাঘ-ভাল্লুক তোমাকে আক্রমণ করেনি মামা? ইভানের প্রশ্ন শুনে থতোমতো খেয়ে গেলাম। বুদ্ধি করে বললাম, এসব দূর থেকে দেখেছি। ভয়ংকর কিছু দেখলেই ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে যেতাম। অমি বলল, এই ইভান তুই মামাকে ডিস্টার্ব করিস না। আপনি বলুন মামা। খুব ভালো লাগছে শুনতে। এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে আবার শুরু করলাম। হ্যাঁ- বাঘ, ভাল্লুক, সাপ অনেক দেখলাম। কিন্তু কোনো হরিণ চোখে পড়ছে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিকালের দিকে হঠাৎ দেখি দূরের একটা গাছের নিচে এক পাল হরিণ। হরিণগুলো কী যেন কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে। কোনো গুলি ছুঁড়লাম না। ভাবলাম এত দূর থেকে গুলি করে কোনো লাভ হবে না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই হরিণগুলো চলে গেল। আমি খুব দ্রুত গাছটির নিচে গেলাম। দেখলাম, অনেক বড়ো একটা আমলকী গাছ। গাছে প্রচুর আমলকী। শুনেছি হরিণের প্রিয় ফল নাকি আমলকী। তাই হরিণের মাংস খেতে কিছুটা টক লাগে। বুঝলে তো সোনামণিরা হরিণের মাংস খেতে কিছুটা টক লাগে কেন? সবাই বলল, এবার বুঝেছি মামা। আমিও বুঝতে পারলাম, আগামীকালও হরিণগুলো এই গাছের নিচে আমলকী খেতে আসবে। যা করার কাল করব। দেরি না করে হোটেলে চলে গেলাম বিশ্রাম নিতে।

হরিণ শিকারের লোভে রাতে ভালো ঘুম হয়নি। পরের দিন সকালে চলে গেলাম সুন্দরবনে। দেখলাম, আমলকী গাছটির নিচে প্রচুর আমলকী ঝরে পড়ে আছে। বড়ো বড়ো দেখে কয়েকটা আমলকী আমিও কুড়িয়ে নিলাম। তোমরা কি জানো আমলকীতে কি ভিটামিন থাকে? প্রমি বলল, জানি মামা। আমলকী ফলে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। আমলকী গাছের পাশেই একটা ঝোপের মাঝে এক্কেবারে অনড় হয়ে বন্দুকটা রেডি করে চুপচাপ বসে রইলাম। অমি আবার প্রশ্ন করল, তোমার ভয় করেনি মামা? বললাম, ভয় করবে কেন? সাথে বন্দুক আছে না? তাছাড়া ভয় পেলে কি কোনো বড়ো কাজ করা যায়?

লজ্জা সংকোচ ভয়
এসব থাকতে নয়।
তবেই হবে জয়
নইলে পরাজয়।

মাঝে মাঝে আমলকী চিবুচ্ছি আর হরিণ আসার অপেক্ষা করছি। বিকাল হতে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি এক পাল হরিণ মাথার শিং উঁচিয়ে দ্রুত আমলকী গাছের দিকে আসছে। আমার খুশির অন্ত নেই। খুব সাবধানে বন্দুকটা কাঁধে পজিশন করে রাখলাম। হরিণের পাল গাছের নিচে এসে আমলকী খাওয়ায় মত্ত হয়ে গেল। আমি ধ্রিম করে একটা বুলেট ছুঁড়লাম। বুলেটটা গিয়ে সরাসরি একটা হরিণের কোমরসহ পিছনের পায়ে লাগে। এক পলকে সব হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ হরিণটা দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। অল্প জায়গার মাঝেই দুই-তিনটা চক্কর দিয়ে পড়ে গেল। তখনই ধারালো ছোরা দিয়ে হরিণটাকে জবাই করলাম। ওই রাতেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। পরেরদিন ভোরে বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম। আমার হরিণ শিকার দেখে তোমাদের মামি, নানা, নানু, ইতু, ইরা সবাই বায়না ধরল এই হরিণের মাংস দিয়ে সবাই বনভোজন করবে। হরিণ রান্না করে সবাই চলে গেলাম সিলেটের জাফলং–এ বনভোজন করতে। বনভোজনের কথা শুনে অমি, প্রমি, ইভান, রুহানও বায়না ধরল ওদেরকে নিয়ে বনভোজন করতে। এই উৎসুকগুলোকে নিয়ে আগামী ছুটির দিন বনভোজনে যাব, এই ওয়াদা করে কোনোরকমে বিদায় নিলাম। ■

সাফওয়ানা শফিক সাফা, চতুর্থ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।

গল্প

টুনুর একদিন

ইউনুস আহমেদ

হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে টুনু। কোনো দিকে খেয়ালই করছে না। হেঁটেই চলছে। আঁকাবাঁকা মেঠোপথ। সবুজ ঘাস বিছানো। যেন সবুজ কার্পেট। দু'পাশে সারি সারি গাছ। অনেকক্ষণ হলো টুনু হেঁটে চলেছে। বাড়ি ছেড়ে বেশ দূরে চলে এল টুনু। এখানে গ্রামের শেষ মাথা। এরপর একটা কাঠের পুল। পুল পেরিয়ে ছোট্ট একটা জঙ্গল। সেদিকেই যাচ্ছে টুনু। খুব অভিমান হয়েছে টুনুর। মা বকা দিয়েছে। তাই ভীষণ অভিমান হয়েছে। ঘটনা আর কিছুই না। বুনুর সাথে ঝগড়া। বুনুটা আবার কে? কে আবার! বুনু ওর ছোটো বোন। পিঠাপিঠি ভাইবোন। নতুন খাতা নিয়ে ঝগড়া। ওর বাবা দুটি খাতা এনেছে। একটা খাতার মলাটে জোড়া শালিকের ছবি। রঙিন ছবি। খুব সুন্দর। টুনু বলল, এটা আমি নিব। বুনু বলল, না

আমি নিব। খাতা নিয়ে টানাটানি। বুনু খাতা টেনে নিয়ে দৌড়ে মায়ের কাছে চলে গেল। টুনুও গেল। কোনোকিছু না শুনেই মা টুনুকে দিলেন ধমক। এতে টুনুর ভারি অভিমান হলো। অভিমান করে টুনু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটো একটা জঙ্গল। টুনু গাছের নিচে বসে আছে। খুব সাহস টুনুর। একাই বসে আছে। চারিদিকে সব গাছপালা। গাছে গাছে কত পাখি ডাকাডাকি করছে। টুনুর মনটা ভালো হয়ে গেল। টুনু অনেক খুশি হলো। পাশের ঝোপ থেকে ছোট্ট একটি খরগোশ ছানা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। সাদা ধবধবে খরগোশ ছানাটা। খুশিতে টুনু হেসে ফেলল। হাসির শব্দ শুনে খরগোশ ছানা ঘাস বনে গিয়ে লুকালো। দুটো ঘুঘু গাছের নিচু এক ডালে এসে বসল। একটা ঘুঘু ডেকে উঠল। কী যে মধুর ডাক! ঝিম দুপুরে টুনুর মনটা ভালো হয়ে গেল। একটা শেয়ালছানা ওর গর্ত থেকে বেরিয়ে হেলেদুলে টুনুর দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ টুনুর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। টুনু বলল, আমাকে ভয় পেয়ো না, আমি টুনু। আমি তোমাদের বন্ধু। কে শোনে কার কথা? শেয়াল ছানা দৌড়ে পালাল। জঙ্গলের মাঝখানে একটু সমতল জায়গা। তার চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ। হঠাৎ এক ঝাঁক শালিক পাখি সমতল জায়গায় এসে নামল। এরপর কিচিরমিচির শুরু করল। টুনুর খুশি দেখে কে? আরে! এই তো শালিক পাখি। খাতার মলাটে দেখেছিল ওদের ছবি। যেটা নিয়ে বুনুর সাথে ঝগড়া। ভারি অবাক হয়ে টুনু তা দেখতে লাগল। সবুজ প্রকৃতি। নানারকম পাখি। পাখিদের মধুর ডাকাডাকি-সবকিছু টুনুর খুব ভালো লেগে যায়। এভাবে টুনুর মনটা খুব ভালো হয়ে গেল।

গুটিগুটি পায়ে টুনু বাড়ির দিকে ফিরে চলল। বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বুনুকে 'সরি' বলবে। বুনুর সাথে আর কখনো সে ঝগড়া করবে না। জঙ্গলের পশুপাখি,গাছপালা কত সুন্দর! কখনো আবার মন খারাপ হলে সে এখানে চলে আসবে। সাথে অবশ্যই বুনুকে নিয়ে আসবে। ■

তাসনোভা আলম লিসান, অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সমার্থক শব্দ

তারিক মনজুর

ভাষা-দাদুর বাড়ির পূর্ব দিকে অনেকখানি খালি জায়গা। সন্ধ্যার সময় ওখানে বসে সবাই আগুন পোহাচ্ছিল। ভাষা-দাদু ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, 'আগুন পোহানো হচ্ছে বুঝি!'

নেহা, পিলটু, বিনুদের সাথে রহমত চাচাও ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড্ড শীত পড়েছে। ওরা বলল একটু আগুন পোহাবে। তাই আগুন জ্বেলে ওদের সঙ্গে বসেছি।'

'তা বেশ, বেশ। আমিও তবে আগুন পোহানোর দলে যোগ দিই।' এই বলে ভাষা-দাদু হাতের লাঠি এক পাশে রাখলেন। তারপর আগুনের পাশে আর সবার মতো গোল হয়ে বসলেন।

বিনু বলল, 'আগুনের আরেক নাম অনল। তাই না, ভাষা-দাদু?'

ভাষা-দাদু উত্তর দেওয়ার আগেই নেহা বলল, 'আগুনের আরো অনেক নাম আছে। যেমন – অগ্নি, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, বৈশ্বানর, বায়ুসখা, জ্বলন, সর্বভূক...'

'থামো, থামো!' হাত উঁচিয়ে পিলটু বলল, 'সমার্থক শব্দ আমার একটুও ভালো লাগে না। কেন যে এগুলো পরীক্ষায় আসে!'

রহমত চাচা ওদের কথা এতক্ষণ শুনছিলেন। তিনিও বলে উঠলেন, 'আমিও বুঝি না, এত কঠিন কঠিন শব্দ কেন স্কুলের স্যাররা মুখস্থ করান।'

ভাষা-দাদু এতক্ষণ চুপ ছিলেন। তিনি বললেন, 'আসলেই তাই। এত সব কঠিন শব্দ স্কুলে মুখস্থ না করালেও চলত। কারণ, আমাদের বাংলা ভাষায় এত কঠিন কঠিন শব্দ আমরা ব্যবহার করি না।'

পিলটু ভাষা-দাদুর কথায় খুশি হয়। সে বলে, 'তাহলে দাদু, তুমি একটু স্কুলের স্যারদের বলে দাও না – যাতে সমার্থক শব্দ পরীক্ষায় না দেয়।'

ভাষা-দাদু এবার রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসেন। বলেন, 'তোমরা কি জানো, সমার্থক শব্দ বলে আসলে কিছু নেই?'

এবার সবার অবাক হওয়ার পালা। বিনু বলল, 'সমার্থক শব্দ বলে আসলেই কিছু নেই? তাহলে, বইয়ে ওগুলো কী লেখা থাকে?'

ভাষা-দাদু বলেন, 'সহজ করে বলি। এই যেমন ধরো, তোমরা পড়েছ সবিতা মানে সূর্য, অরুণ মানে সূর্য, আবার মার্তণ্ড মানেও সূর্য। কিন্তু সবিতা, অরুণ আর মার্তণ্ড এক নয়।'

'তার মানে?' তিন জনই একসঙ্গে বলে ওঠে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'সবিতা মানে ভোরবেলার সূর্য। যে সূর্য এখনো ওঠেনি, কেবল উঠি উঠি করছে, তার নাম সবিতা। অরুণ হলো সকালের প্রথম সূর্য। ঠিক একেবারে ডিমের কুসুমের মতো রং যার। আর মার্তণ্ড হলো দুপুরের গনগনে সূর্য।'

'এটা তো আগে জানতাম না!' নেহা বলে, 'তাহলে, দাদু, বইয়ে সমার্থক শব্দের মধ্যে ওগুলো লেখা থাকে কেন?'

'সমার্থক বলতে আমরা বইতে যা লিখি – ওগুলো আসলে প্রায় সমার্থক। তবে এত কিছু তোমাদের না ভাবলেও চলবে। তোমরা সমার্থক শব্দ হিসেবেই ওগুলো শিখবে।'

'কিন্তু দাদু, সমার্থক শব্দ যে বড়ো কঠিন!' পিলটুর গলা খানিক কাঁদো কাঁদো শোনায়।

'কঠিন, আমিও মানছি। সবগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, তাও মানছি। কিন্তু সমার্থক শব্দের মধ্যেও মজা আছে।'

'মজা!' পিলটুর বিশ্বাস হতে চায় না।

ভাষা-দাদু বললেন, 'ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। গোল থালার মতো একটা জিনিস। তাই না?'

নেহা বলল, 'ওই থালার মতো জিনিসটা একটা চাঁদ।'

'সেই চাঁদের গায়ে কোনো দাগ দেখতে পাচ্ছ? কালো কালো ছোপ ছোপ?'

'ওগুলো চাঁদের কলঙ্ক।' বিনু বলে।

'না, না, কলঙ্ক না!' পিলটু বিজ্ঞানে ভালো। তাই সে নিজেই ব্যাখ্যা দিলো, 'চাঁদে আছে উঁচুনিচু পাহাড়-পর্বত, খানাখন্দ। সূর্যের আলো ওইসব জায়গায় ভালো করে প্রতিফলিত হতে পারে না। তাই কালো কালো দেখায়।'

'ওরে, বাব্বাহ!' রহমত চাচা হাততালি দিয়ে উঠলেন, 'আমাদের পিলটু একদিন বড়ো বিজ্ঞানী হবে।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'ঠিক তাই! কিন্তু এক সময় ওই দাগগুলো দেখে মানুষের কাছে মনে হয়েছে, হয়ত

চাঁদের বুকে কোনো খরগোশ বসে আছে। তাই চাঁদের আরেক নাম হয়েছে – শশী, শশধর, শশাঙ্ক।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, ভাষা-দাদু।' বিনু বলে।

'শশ মানে কি খরগোশ?' মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে নেহা।

'হ্যাঁ, শশ মানে খরগোশ। শশ আছে বলে চাঁদের নাম শশী। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, শশ ধরে যে – তার আরেক নাম শশধর। একইভাবে, শশ অঙ্কে যার, মানে শশ কোলে যার – তার নাম শশাঙ্ক।'

'দারুণ তো!' পিলটু বলে, 'কিন্তু এগুলো তো আমাদের স্যাররা এভাবে পড়ান না।'

ভাষা-দাদু পিলটুর এই কথার উত্তর না দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'পানি নিয়েও মজা আছে। পানির আর কোনো সমার্থক শব্দ বলতে পারো?'

বিনু উত্তর করে, 'পানির সমার্থক শব্দ – জল, বারি, নীর, অম্বু ...'

'এখন দেখো, জল দেয় মেঘ। তাই মেঘের আরেক নাম জলদ। বারি দেয় মেঘ। তাই মেঘের আরেক নাম বারিদ। নীর দেয় মেঘ। তাই মেঘের আরেক নাম নীরদ। অম্বু দেয় মেঘ। তাই মেঘের আরেক নাম অম্বুদ।' ভাষা-দাদু গড়গড়িয়ে বলে যান।

'বাহ্, ভারি মজা তো!' পিলটু বলল।

'মজা এখানেই শেষ নয়। এবার সাগরের দিকে তাকাও। জল ধারণ করে সাগর। তাই সাগরের নাম জলধি। বারি ধারণ করে বলে সাগরের নাম বারিধি। নীর ধারণ করে বলে সাগরের নাম নীরধি। অম্বু ধারণ করে বলে তার আরেক নাম অম্বুধি।'

পিলটু এবার নিজে নিজেই বলে, 'জল-জলদ-জলধি। বারি-বারিদ-বারিধি। নীর-নীরদ-নীরধি। অম্বু- অম্বুদ-অম্বুধি।'

'পানি, মেঘ আর সাগরের কী সুন্দর সম্পর্ক!' বিনুও হেসে ওঠে।

ভাষা-দাদু এবার রহমত চাচার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আগুন নিভিয়ে তবে এবার ওঠা যাক। রাত তো কম হয়নি।' ■

স্মৃতির পাতায়

মেশকাউল জান্নাত বিথী

কতই না ভালোবেসেছে
এই দেশের মাটি
তাই তো তাঁরা জীবন দিয়ে
মন করেছে খাঁটি।
তাঁদের আত্মত্যাগ স্মৃতির পাতায়
আজও লেখা আছে
তাঁরাই আজ দেশের বুকে
প্রাণ হয়ে বাঁচে।
তাঁরা দেশের কৃতী সন্তান
গাইব তাদের গান
জীবন দিয়ে হলেও মোরা
রাখব তাদের সম্মান।

৮ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

আমার গাঁয়ের শীত

তারিকুল ইসলাম সুমন

ধানের ক্ষেতের সরু পথে শিশির ভেজা ঘাসে
পুব আকাশের ঝিলিক পেয়ে মুক্ত হয়ে হাসে।
প্রজাপতি চুম দিয়ে যায় কুমড়ো ফুলে ফুলে
মাচার ডালে দোয়েল নাচে ডানা খুলে খুলে।
খেজুর গাছে বইছে নহর মৌমাছিদের ভিড়ে
ভাত শালিকে খাবার খুঁজে এক নিমেষেই নীড়ে।

চতুর পায়ে ডাহুক চলে কেয়া বনের ফাঁকে
বেজি ছানার মুখটি উঁচু মাটি ঢিবির বাঁকে।
স্বর্ণ লতায় জাপটে ধরা গেওয়া গাছের ডাল
হিম কুয়াশার চাদর ফেলে তুলছে মাঝি পাল।
উঠোন জুড়ে পালং-কপি ছড়ায় হাসির রেশ
এমন রূপে শীতের সকাল, আমার গাঁয়ে বেশ।

আমাদের গ্রাম

ছাদির হুসাইন ছাদি

আমাদের গ্রামে নামে
পাখিদের ঢল,
হেসে-খেলে মেতে ওঠে
কিশোরের দল।
হাট মাঠঘাট ভরা
প্রকৃতির রূপ,
পাড়ায় পাড়ায় জ্বলে
স্নেহময়ী ধূপ।
নদীনালা খালবিল
করে কত খেলা,
অবিরত আসে যায়
মাঝিদের ভেলা।
চারিদিকে ঝকঝকে
সবুজের ভাঁজ,
রূপেগুণে ভরপুর
অপরূপ সাজ।

শীত ঋতুটা

অনিক মাযহার

মন মাতিয়ে নীল ঘুড়িরা
মেলছে ডানা দূরে,
আবছা আলোয় হিম কুয়াশা
সর্ব শরীর জুড়ে।
জবুথবু পশুপাখি,
নদীনালা গাছও-
ঘাপটি মেরে একটি কোণে
রয় যে পুঁটি মাছও।
সন্ধ্যা হলেই ব্যস্ত লোকের
ঘরে ফেরার ঢল,
কারো আবার রাত কাটানোর
চিন্তা অনর্গল।
এমনভাবেই শীত ঋতুটা
প্রতি বছর আসে,
কেউবা আবার দূরে ঠেলে
কেউবা ভালোবাসে।

নিবন্ধ

শীতের পাখি

শেখ এ কে এম জাকারিয়া

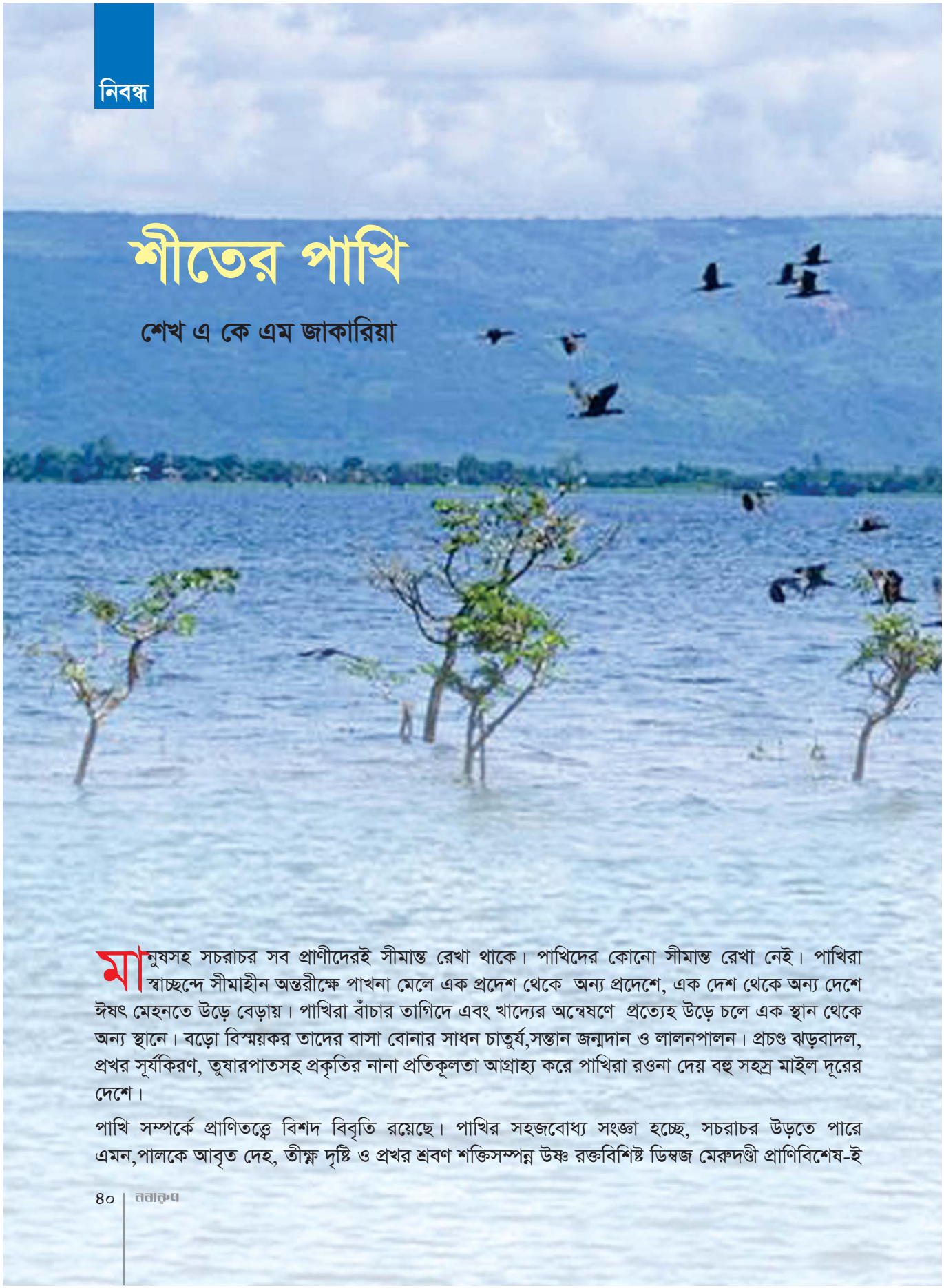

মানুষসহ সচরাচর সব প্রাণীদেরই সীমান্ত রেখা থাকে। পাখিদের কোনো সীমান্ত রেখা নেই। পাখিরা স্বাচ্ছন্দে সীমাহীন অন্তরীক্ষে পাখনা মেলে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঈষৎ মেহনতে উড়ে বেড়ায়। পাখিরা বাঁচার তাগিদে এবং খাদ্যের অন্বেষণে প্রত্যেহ উড়ে চলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। বড়ো বিস্ময়কর তাদের বাসা বোনার সাধন চাতুর্য,সন্তান জন্মদান ও লালনপালন। প্রচণ্ড ঝড়বাদল, প্রখর সূর্যকিরণ, তুষারপাতসহ প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতা আগ্রাহ্য করে পাখিরা রওনা দেয় বহু সহস্র মাইল দূরের দেশে।

পাখি সম্পর্কে প্রাণিতত্ত্বে বিশদ বিবৃতি রয়েছে। পাখির সহজবোধ্য সংজ্ঞা হচ্ছে, সচরাচর উড়তে পারে এমন,পালকে আবৃত দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রখর শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট ডিম্বজ মেরুদণ্ডী প্রাণিবিশেষ-ই

পাখি। অথবা দুই ডানা ও দুই পা যুক্ত এবং সাধারণত আকাশে ওড়ার ক্ষমতাযুক্ত ডিম প্রসবকারী প্রাণীই পাখি। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে পাখির বিভিন্ন নাম দেখতে পাওয়া যায়। তারমধ্যে পক্ষি, বিহগ,বিহঙ্গ, খগ ইত্যাদি উল্লেখ্য। প্রাণিতত্ত্বের হিসাব মতে, সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী নবগ্রহের অন্যতম গ্রহ পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখির মধ্যে ১৮৫৫ প্রজাতির পাখিই (প্রায় ১৯%) পরিযায়ী।

ভারত উপমহাদেশে এই সময়ে ২ হাজার ১ শত প্রজাতির পাখি আছে। যাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ শত প্রজাতির পাখি শীত ঋতু আগমনের পূর্বে হেমন্ত ঋতুর প্রায় মধ্য ভাগে ভারতের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত বরফে ঢাকা বিশ্বের বৃহত্তম পর্বতশ্রেণি হিমালয়সহ অন্যান্য ছোটোখাটো পর্বতশ্রেণি অতিক্রম করে আমাদের দেশে উপস্থিত হয়। এসব পাখিদেরই আমরা পরিযায়ী পাখি, শীতের পাখি, অতিথি পাখি ইত্যাদি বিভিন্ন

নামে অভিহিত করে থাকি। সাধারণভাবে পরিযায়ী পাখির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখতে হয়, শীত ঋতুতে অস্থায়ী বসবাসের জন্য উষ্ণতর দেশে গমন করে এমন পাখি, পরিযায়ী পাখি। এ দেশে মৃদু হাওয়ায় যে সময়ে শীতের আভাস দেখা দেয় সে সময়ে হাওর-বাঁওড়, খালবিল, চরাঞ্চলে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা মিলে। এসব পাখির অর্ধেকের বেশি ইংল্যান্ডের নর্থ হ্যামশায়ার,সাইবেরিয়া, অ্যান্টার্কটিকার শীতাধিক্য থেকে নিজেদের বাঁচাতে এবং আহারের খোঁজে চলে আসে আমাদের দেশসহ অপরাপর কম শীতের দেশগুলোতে। তাছাড়া মঙ্গোলিয়া, জিনজিয়াং, ভারত, নেপাল,পাকিস্তানসহ শীতপ্রধান অঞ্চল থেকেও আসে নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। পরিযায়ী পাখি সাধারণত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের দিকে আমাদের দেশে দলবেঁধে আসা শুরু করে।

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এসব অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সবুজ-হলুদ ছায়া ঘন রূপসি বাংলার নয়ন মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি। অতঃপর এসব পরিযায়ী পাখিদের শুরু হয় নিজ দেশে ফেরার পালা। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি এ দু-মাসে সবচেয়ে বেশি পাখি আসে আমাদের বাংলাদেশে। স্বভাবগতভাবেই পাখিদের শরীরবিষয়ক অবয়ব অনেকটা দৃঢ়। পাখি সাধারণত ভূমি থেকে অর্থাৎ ৬০০ থেকে ১৩০০ মিটার উপর দিয়ে উন্মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায়। যেসব পাখি ছোটো আকৃতির তাদের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার। আর ২৪ ঘন্টায় অর্থাৎ দিনরাত মিলিয়ে এসব পাখি প্রায় ২৫০ কিলোমিটার উড়তে পারে।

অপরদিকে, যেসব পাখি বড়ো আকৃতির তারা ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার সামান্য পরিশ্রমেই উড়তে পারে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এসব পরিযায়ী পাখি তাদের গমনের লক্ষ্যস্থল শতভাগই ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। শীত ঋতু এলেই অতিথি পাখির মধুর গুঞ্জনধ্বনিতে 'দি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' খ্যাত সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরের নয়কুড়ি কান্দা, ছয়কুড়ি বিল মুখরিত হয়ে ওঠে। এ হাওরের কান্দা ও বিলে প্রায় ৫১ প্রজাতির পাখি বিচরণ করে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে এ হাওরে আছে বিরল প্রজাতির প্যালাসেস ঈগল, বড়ো আকারের গ্রে কিংস্টর্ক। স্থানীয় জাতের মধ্যে নিয়মিত বিচরণ আছে শকুন, পানকৌড়ি, বেগুনি কালেম, ডাহুক, বালিহাঁস, গাঙচিল, বক, সারস, কাক, শঙ্খচিল, পাতি কুট ইত্যাদি পাখির। এছাড়া আছে বিপন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি কুড়ুল। ২০১১ সালের পাখি গণনাতে এই হাওরে চটাইন্নার বিল ও তার খাল, রোয়া বিল, লেচুয়ামারা বিল, রুপাবই বিল, হাতির গাতা বিল, বেরবেরিয়া বিল, বাইল্লার ডুবি, তেকুন্না ও আন্না বিলে প্রায় ৪৭ প্রজাতির জলচর পাখি বা ওয়াটারফাউলের মোট ২৮,৮৭৬টি পাখি গণনা করা হয়। এ গণনাতে অপরাপর পাখির পাশাপাশি নজরে আসে কুট,মরিচা ভুতিহাঁস, পিয়ংহাস; ভুতিহাঁস,পান্তামুখী বা শোভেলার, লালচে মাথা ভুতিহাঁস, লালশির, নীলশির, পাতিহাঁস, লেনজা, ডুবুরি, পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখিও।

ওপরে বা পূর্বে লিখিত পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাখি হচ্ছে জেন্ডা সিগলা (জাডানিক) বা সরালি হাঁস। এসব হাঁস দলবেঁধে শিস দিতে দিতে উড়ে চলে এক বিল থেকে অন্য বিলে, এক হাওর থেকে অন্য হাওরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে। কালচে, বড়ো ও লম্বা গলার এ হাঁস দেখতে অবিকল দেশীয় পাতিহাঁসের মতো। টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ে বসবাসরত লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, সরালি হাঁস দিনের প্রথমভাগে ও শেষভাগে দলবেঁধে হাওর জলে সাঁতার কাটে ও মাছ ধরে। দিনের হালকা মিষ্টি রোদ এদের খুব প্রিয়। টাঙ্গুয়ার হাওর ছাড়াও দেশের অন্যতম উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মিরপুর চিড়িয়াখানার লেক, বরিশালের দুর্গাসাগর, নীলফামারীর নীল সাগর, সিরাজগঞ্জের হুরা এসব পরিযায়ী বা অতিথি পাখিদের পছন্দের অবকাশ কেন্দ্র। মূলকথা,বাংলাদেশের যত জলাশয়াদি রয়েছে সবই যেন এসব পরিযায়ী, ভিনদেশি, অতিথি পাখিদের নিরাপদ অভয়ারণ্য। বেশ কয়েক বছর ধরে নিঝুম দ্বীপ, দুবলার দ্বীপ, চরকুতুবদিয়া এলাকাতেও শীতের পাখিদের বসতি গড়তে দেখা যাচ্ছে।

পাখি শিকারের মতো নিষ্ঠুর কাজ বন্ধ করতে হলে আমাদের গণসচেতনতা বাড়ানো খুবই জরুরি। এজন্য পত্রপত্রিকায় নিউজসহ রেডিও-টেলিভিশনে বিবিধ ডকুমেন্টারি প্রচার করতে হবে।

পরিযায়ী পাখির জন্য সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১২টি অভয়াশ্রম থাকার কথা। কিন্তু বস্তুত অভয়াশ্রম বলতে যা বুঝায় তা আজ অবধি সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠেনি। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, পাখি শিকার ও হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ।

পত্রিকাদি পাঠে জানা যায়, সবুজ-হলুদ ছায়াঘন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ, পাখির দেশ, গানের দেশ, কবিতার দেশ বাংলাদেশ পেয়েছে অতিথি পাখি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ফ্রেন্ডশীপ ইস্ট এশিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান ফ্লাইওয়ে নামক অতিথি পাখি সংরক্ষণ ও গবেষক সংস্থা বাংলাদেশকে এ স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে স্বীকৃতিমূলক সনদপত্র হস্তান্তর করে।

সংস্থাটির দেওয়া সনদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাটল হাওর, নিঝুম দ্বীপ ও সোনাদিয়া-এই পাঁচটি এলাকা পরিযায়ী পাখিসমৃদ্ধ অঞ্চল। তাদের মতে, এসব এলাকায় বহু বছর ধরে পরিযায়ী পাখিরা নিরাপদে বাস করছে। তড়িৎ গতিতে এসব অঞ্চল সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। কঠোর আইন অর্থাৎ সহজে শিথিল নয় এমন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি গণসচেতনতা ও সৌন্দর্য পিপাসু দৃষ্টিভঙ্গিই বাঁচাতে পারে এসব পরিযায়ী পাখিদের। প্রকৃতির উপমাহীন উপঢৌকন পরিযায়ী পাখি শুধু আমাদের সম্পদ নয়, সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে, নিজেদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এদেরকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ থেকে বাঁচতে উত্তরের যেসব পাখি আমাদের দেশে আশ্রয় নেয় তাদের এই দুঃসময়ের সুযোগ নেওয়া নৈতিকতার পরিপন্থী। পরিশেষে দেশের সব মানুষকে বলতে চাই,আমাদের হরিৎ হরিদ্রা ছায়াঘন অমলিন প্রকৃতিতে এসব পরিযায়ী পাখি যেন পায় মেহমানের যত্নআত্তি ও নির্মল সুস্থিরতা, তাদের যেন যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্টও না হয়। তারা যেন নিজেদের জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, পরিজনসহ স্বদেশে সুস্থ ও সুন্দরভাবে ফিরে যেতে পারে এ সুযোগ তাদের দিতে হবে। ■

অতিথি পাখি

আহসানুল হক

পরিযায়ী পাখিরা সব
ডানায় ভেসে ভেসে
শীত প্রারম্ভে আসে ওরা
আসে বাংলাদেশে !

বাংলাদেশের হাওর-বাঁওড়
বিল-জলাশয়-বনে
শীত পাখিরা আবাস গড়ে
আনন্দেরই সনে !

সারস, খঞ্জন, হট্টিটি-বাজ
ফুটফুটি, হুদহুদ
কত্ত রকম পাখি আসে
নামও যে কী অদ্ভুত !

কেউ মেরো না এই পাখিদের
বিষটোপে ও ফাঁদে
পাখির মায়ায় সবার হৃদয়
সত্যি যেন কাঁদে !

যারা করে পাখি শিকার
রসনা মেটায় স্বাদে
এই কর্মের কী পরিচয়
নিষ্ঠুরতা বাদে ?

সকালের পাখি

রিপলু চৌধুরী

সূয্যি মামা উঠার সাথে
সকালবেলার পাখি
সূর্যের আলো দেখে দেখে
উঠল পাখি ডাকি।

পাখির ডাক শুনে খোকার
ঘুম ভেঙে উঠে
চেয়ে দেখে বাড়ির পাশে
ভোরের ফুল ফুটে।

ফুলের সুবাসে মনের হর্ষে
সকালবেলার পাখি
শুভ সকাল জানিয়ে আমায়
করল ডাকাডাকি।

অতিথি পাখি

সাবরিনা আক্তার

রং-বেরঙের অতিথি পাখি
যায় যে দেখা শীতকালে
এরা থাকে বাংলাদেশের
নদীনালা আর খালবিলে।

ছোটো-বড়ো ঝাঁকে ঝাঁকে
আকাশ পানে উড়ে চলে
কিচিরমিচির মধুর ডাক
শুনতে অনেক ভালো লাগে।

৭ম শ্রেণি, মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারি

প্রশ্ন কন্যা

রাহান তাপস

কথায় কথায় শুধু প্রশ্ন। এই হলো মোমের স্বভাব। মুখে যেদিন থেকে কথার খই ফুটল, সেদিন থেকেই এই প্রশ্ন যাত্রা। নতুন কিছু একটা দেখলেই এটা-ওটা কত কী যে প্রশ্ন তার কোনো সীমা নেই। অনর্গল রেলগাড়ির মতো প্রশ্ন করেই চলে। অনেকে এতে রাগ করে। পরক্ষণে আর কথাই বলে না। মোম তবুও প্রশ্ন করে যায়, পরিচিত কী অপরিচিত, সে যেই হোক। এর জন্য মোমের বাবা মোমকে প্রশ্ন কন্যা বলে ডাকেন। এই নামটা আবার মোমের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি রাহান চাচারও খুব পছন্দ। তাই রাহান চাচাও প্রশ্ন কন্যা বলে ডাকে। আর মোমেরও এই নাম শুনতে ভালো লাগে। আস্তে আস্তে বাসার সবাই মোমকে প্রশ্ন কন্যা বলে ডাকা শুরু করে।

রাহান চাচা প্রশ্ন কন্যার কোনো প্রশ্নতেই রাগ তো করেই না বরং সে আরো উৎসাহ দেয় এবং সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। এতে প্রশ্ন কন্যার মা বিরক্ত হয়ে বলে, 'এত পটর পটর করো কেন?'

তখন রাহান চাচা বলে, 'এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই কারণ ছাড়া ঘটে না। দেখো তোমার এই মেয়ে, একদিন বড়ো হয়ে একজন নামকরা দার্শনিক হবে। তখনই বুঝবে এই মেয়ে ছোটোবেলায় এত প্রশ্ন কেন করত'।

মায়ের বিরক্তিকর মুখ দেখে প্রশ্ন কন্যা আর প্রশ্ন করার সাহস পায় না।

সে রাহান চাচার কথার সবটুকু বুঝল না। শুধু এইটুকু মনে রাখল 'পৃথিবীতে কোনো কিছুই কারণ ছাড়া ঘটে না।' প্রশ্ন কন্যা এই তথ্যের অর্থ বুঝল অনেক বছর পরে। তখন প্রশ্ন কন্যা ক্লাস সেভেনে পড়ে। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শেষ। স্কুল গরমের ছুটি দিয়েছে। তাই রাহান চাচা প্রশ্ন কন্যাকে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে গেল। গ্রামে প্রশ্ন কন্যার মতো সমবয়সি এক চাচাতো বোন আছে। নাম তার মীম। তারা দু-বোন মিলে সারাটা গ্রাম ঘুরে বেরাতো। গ্রামে এক জিনে ধরা ছেলে ছিল। সেই জিনে ধরা ছেলেটি দিনদুপুরে তেঁতুল গাছের মগডালে বসে গান গাইত আর তেঁতুল খেতো। একদিন দুপুরে প্রশ্ন কন্যা আর মীম সেই তেঁতুল তলায় গেল। গাছের উপরে সেই জিনে ধরা ছেলেটিকে দেখে দু-বোনই চমকে গেল। পরক্ষণে মীম বলে, 'এই ছেলেটিকে তেঁতুল গাছের ভূতে ধরেছে'।

প্রশ্ন কন্যা বলে, 'ভূত, প্রেতাত্মা বলে কিছু নেই পৃথিবীতে।'

তখন মীম বলে, 'তাহলে এই আবুল কেন গাছের মগডালে বসে গান করছে? ওকে কি তাহলে মগ্ন জিন ধরেছে!'

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রশ্ন কন্যা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনে মনে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকে আর ভাবে কারণ তো অবশ্যই আছে।

বাড়ি এসে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করল। এর কিছুক্ষণ পরেই কারেন্ট চলে গেল। টিনের ঘর। দুপুরের রোদে ঘরের চাল গরমে টগবগ করে। কারেন্ট চলে যাওয়াতে পাখাও বন্ধ হয়ে গেল। আর তখনই অনুভব করল চৈত্রের কাঠফাটা গরম। আর সেইসঙ্গে আবুলের মগডালে উঠার কারণ পেয়ে গেল। এই গরমের মধ্যে গাছের মগডালে খুব বাতাস লাগে। তাই আবুল গাছের ডালে বসে আরামে তেঁতুল খাচ্ছে আর গান করছে। আর এরই জন্য সবাই তাকে বলছে ভূতে ধরেছে। আসলে গ্রামের মানুষের অজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ।

ব্যাপারটা প্রশ্ন কন্যার বোধগম্য হওয়াতে নিজেকে খুব বুদ্ধিমতি মনে করছে। সেইসাথে অনেক বছর আগে রাহান চাচার সেই কথাও মনে পড়ছে। 'কোনো কিছুই এমনি এমনি ঘটে না। এর পিছনে কারণ থাকে।'

তারপর আর একদিন প্রখর রোদে দু-বোন গেল খালের পাড়ে মাছ ধরতে। চারিদিকে দুপুরের নিস্তব্ধতা। কাছেই একটা গরু দাঁড়িয়ে। সম্ভবত সকাল থেকেই এখানে বাঁধা অবস্থায় আছে। ঘাস খেতে খেতে অরুচি এসে গেছে তাই দাঁড়িয়ে রোদের মধ্যে ওদেরকে দেখছে। প্রশ্ন কন্যার এত রোদে থাকার অভ্যাস নেই। সে প্রচুর ঘামাচ্ছে।

অসহ্য গরম। মীমকে বলল, 'চলো বাসায় যাই।'

মীম বলল, 'না আর একটু মাছ ধরি। তুমি গাছের ছায়ায় বসো।'

প্রশ্ন কন্যা বলল, 'কিন্তু ধারেকাছে তো কোনো বড়ো গাছ নেই।'

গাছ দেখানোর জন্য মীম যেই ঘাড় ঘুরালো ওমনি ঐ গরুটার দিকে চোখ পড়ল। আর সাথে সাথে মীম চিৎকার দিয়ে উঠল।

প্রশ্ন কন্যা বলে, 'কী হয়েছে?'

মীম বলল, 'চলো! এখানে ভূতের বাতাস এসেছে! ঐ দেখো গরুটা কেমন উলটাপালটা করছে। মুহূর্তে গরুটা মাটিতে লুটুপুটু খাচ্ছে।

দু'জনেই দৌড় দিল বাড়ির দিকে। প্রশ্ন কন্যা একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে তাকাল গরুটার দিকে। গরুটা তখনো মাটিতে ছটফট করছে। আবার মীমের দিকে তাকাতেই দেখে মীম অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির আঙিনায় এসে মীম অজ্ঞান হয়ে গেল। সবাই মাথায় অনেক পানি দিলো আর ঘটনা জানতে চাইল। কী হয়েছে; কী দেখেছ ইত্যাদি। এরই মধ্যে গ্রামের অনেক মানুষ বলছে যে, মীমকে ভূতে ধরেছে।

প্রশ্ন কন্যা এ সবের কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষে রাহান চাচাকে ব্যাপারটা খুলে বলল।

রাহান চাচা প্রশ্ন কন্যাকে নিয়ে আবার গেল সেই গরুটার কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! গরুটা আবার চুপচাপ আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। তবে তার সমস্ত শরীর ভিজা।

প্রশ্ন কন্যা চাচাকে বলল, 'গরুটাকে কি মগ্ন জিনে ধরেছিল?'

রাহান চাচা একটু হাসল। পরক্ষণে বলল, 'যখন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তখন আমরা বলি ভূত, পেতনি ইত্যাদিতে ধরেছে।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'জিন, ভূত, মগ্ন জিন বলে কিছু নেই। সবই মানুষের ভুল এবং ভয় পেলে বলে থাকে। আসলে জিন,ভূত বলে পৃথিবীতে কিছুই ছিল না এবং এখনো নেই।'

প্রশ্ন কন্যা আবার বলল, 'তাহলে এই গরুটার কী হয়েছিল?'

রাহান চাচা উত্তর দিলো, 'এই গরুটা সারাদিন এই প্রখর রোদের মধ্যে থাকাতে ও মাথা ঘুরে পড়েছিল। যখন গড়াগড়ি খেতে খেতে হঠাৎ খালের পানির মধ্যে পড়েছে তখনই গরুটার মাথা ঠান্ডা হয়েছে আর ঠিক তখন তার শরীর সুস্থ হয়ে গেল।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রশ্ন কন্যার খুব আনন্দ লাগছে। বাড়ি ফিরে মীমকেও সব বোঝালো।

তখন মীম বলল, 'আসলেই আমাদের সবার বেশি বেশি প্রশ্ন করা উচিত আর নিজে নিজে তার উত্তরও খোঁজা উচিত। তা না হলে আমার মতো সবাই কুসংস্কারেই থেকে যাবে। ■

অনুবাদ
রূপকথা

সাহসী মোরগ

আবুল বাসার

এক দেশে ছিল এক মোরগ। ভোরবেলা সবার আগে ঘুম ভেঙে যেত তার। ঘুম থেকে জেগে সে ডেকে উঠত, 'কুর...উক...ক...ক! কুর...উক...ক...ক!'

এক সকালে ঘুম ভেঙে দলবল নিয়ে বাইরে বের হয়েছে মোরগ। এমন সময় মাটিতে একটা সোনার মোহর পড়ে থাকতে দেখল সে। আনন্দে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'কুর...উক...ক...ক! কী মজা! আমি সোনার মোহর পেয়েছি।'

সারাদিন যেখানে গেল, সেখানেই চিৎকার করে এই কথা বলতে লাগল মোরগ।

কথাটা এক সময় রাজার কানে গেল। তার লোকজনকে মোরগের কাছ থেকে সোনার মোহরটা কেড়ে আনার নির্দেশ দিলেন তিনি।

রাজার লোকজন মোরগের কাছ থেকে সোনার মোহরটা জোর করে কেড়ে এনে রাজার হাতে তুলে দিলো।

মোরগের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'কুর...উক...ক...ক! ছি ছি ছি! রাজামশাই আমার সম্পদ কেড়ে নিয়েছে!'

সারাদিন যেখানে গেল, সেখানেই এই বিলাপ করতে লাগল সে। লোকজন শুনে আড়ালে ছি ছি করতে লাগল রাজার নামে। রাজাও মোরগের বিলাপ শুনে বিরক্ত হয়ে গেলেন।

তিনি এবার তার লোকজনকে মোরগের সোনার মোহরটা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মোহরটা ফেরত পেয়ে মোরগের আনন্দ আর ধরে না! সে এবার গর্ব করে বলতে লাগল, 'কুর... উক...ক...ক! কী মজা! রাজা ভয় পেয়ে, আমার মোহর ফেরত দিয়েছে।'

সারাদিন যেখানে গেল, সেখানেই চিৎকার করে একই কথা বলতে লাগল মোরগ। রাজ্যের লোকজন এবার আড়ালে হাসাহাসি করতে লাগল।

মোরগের চিৎকার শুনতে শুনতে রাজার কানও ঝালাপালা হয়ে গেল।

রাগে গজগজ করতে করতে তিনি তার লোকজনকে নির্দেশ দিলেন, 'এক্ষুনি ওই পাজি মোরগকে ধরে আনো। জবাই করে রান্না করে আমার সামনে হাজির করো।'

রাজার নির্দেশ পালিত হতে খুব বেশি সময় লাগল না। মোরগকে রাজপ্রাসাদে ধরে আনা হলো। মোরগ এবার চিৎকার করে বলল, 'কুর...উক...ক...ক! কী মজা! রাজা আমাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছে।'

নিখিল দাস, পঞ্চম শ্রেণি, রেলওয়ে স্কেভেঞ্জার্স, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

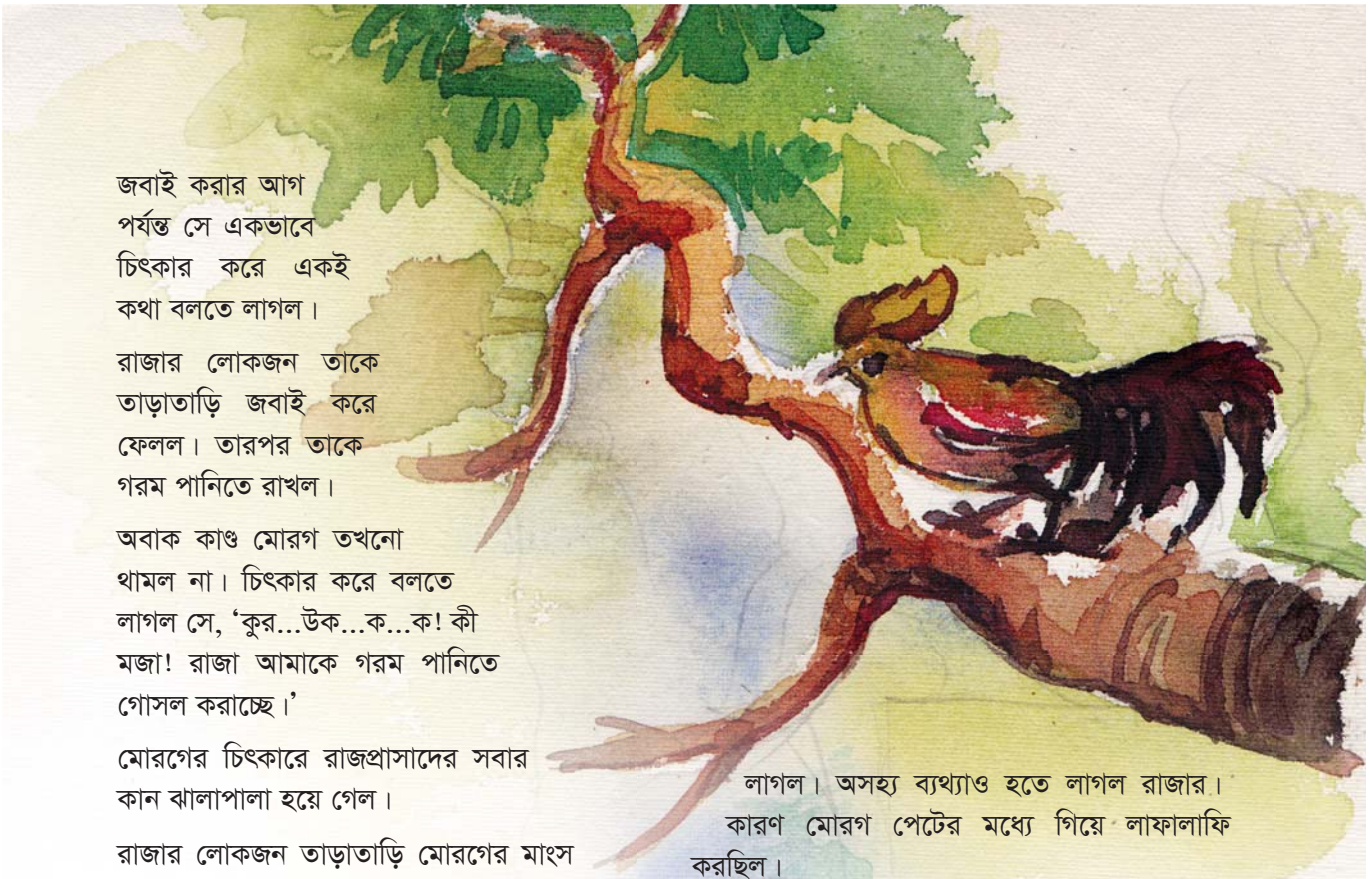

জবাই করার আগ পর্যন্ত সে একভাবে চিৎকার করে একই কথা বলতে লাগল।

রাজার লোকজন তাকে তাড়াতাড়ি জবাই করে ফেলল। তারপর তাকে গরম পানিতে রাখল।

অবাক কাণ্ড মোরগ তখনো থামল না। চিৎকার করে বলতে লাগল সে, 'কুর...উক...ক...ক! কী মজা! রাজা আমাকে গরম পানিতে গোসল করাচ্ছে।'

মোরগের চিৎকারে রাজপ্রাসাদের সবার কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

রাজার লোকজন তাড়াতাড়ি মোরগের মাংস রান্না করে রাজার সামনে আস্ত মোরগের রোস্ট হাজির করল। রাজা টেবিলে বসতে না বসতেই মোরগ আবার চিৎকার করে বলে উঠল, 'কুর...উক...ক...ক! কী মজা! রাজার সাথে খেতে বসেছি আমি।'

দেরি না করে রাজা মোরগকে খেতে শুরু করলেন। কোনোমতে চিবিয়ে তিনি গিলতে লাগলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তাতেও থামল না মোরগ। রাজামশাইয়ের গলা দিয়ে পেটের ভেতর যাওয়ার সময় মোরগ আবারও চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কুর...উক...ক...ক! একি হলো! সরু রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে।'

রাজা খুব রেগে গেলেন।

ওদিকে রাজার সরু গলা দিয়ে এক সময় পেটে গিয়ে পৌঁছাল মোরগ। পেটের মধ্যে গিয়ে মোরগ আবার বলল, 'কুর...উক...ক...ক! কী দুর্ভাগ্য আমার! এতদিন আমার চারিদিকে কত আলো ছিল! কিন্তু এ কোথায় এলাম! চারিদিকে অন্ধকার।'

ওদিকে রাজার পেট ভটভট করতে লাগল। মোচড়াতে লাগল। অসহ্য ব্যথ্যাও হতে লাগল রাজার। কারণ মোরগ পেটের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করছিল।

রাজা এবার তার লোকজনকে নির্দেশ দিলেন, 'মোরগ বেটা যদি আরেকবার চিৎকার করে, তাহলে তলোয়ার চালাবি পাজিটার উপর!'

চাকর 'জি আচ্ছা' বলে তলোয়ার বাগিয়ে ধরল।

পেটের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করতে করতে মোরগ আবারো চিৎকার করে বলল, 'কুর...উক...ক...ক! কী দুর্ভাগ্য আমার! এতদিন আমার চারিদিকে কত আলো ছিল! কিন্তু এ কোথায় এলাম! চারিদিকে অন্ধকার।'

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল রাজার চাকর। সে সাঁই করে তলোয়ার চালালো মোরগ লক্ষ্য করে, মানে রাজার পেট লক্ষ্য করে।

তাতে রাজার পেট কেটে দু-ভাগ হয়ে গেল। কাতরাতে কাতরাতে রাজা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

ওদিকে মোরগ রাজার পেট থেকে বের হয়ে এল। তারপর রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠে চিৎকার করে বলল, 'কুর...উক...ক...ক! কী মজা! কী মজা! রাজা কুপোকাত।' ■

বিজয় ফুল উৎসব ২০১৯

আলেয়া রহমান

নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উপলব্ধি এবং সংগ্রামী ইতিহাস জানানোর উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'বিজয় ফুল' তৈরি, গল্প, কবিতা, রচনা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয় ও চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং দলগত দেশাত্মবোধক ও জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা ২০১৯ আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। মূল দায়িত্বে ছিল সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের স্মরণে ডিসেম্বরে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয় ফুল শুধু একটি দেশের প্রতীক বা স্মারক নয় একটি পন্থাও বটে। এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সর্বোপরি আমাদের দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পারি। শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল, শাপলা বিজয়ের প্রতীক। বিজয় ফুলের ছয়টি পাপড়ি ও মাঝখানে একটি কলি রয়েছে। মাঝখানের কলিসহ সাতটি ভাগ আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে ছয়টি পাপড়ি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্কুল,কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আন্তঃপ্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়ে জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে চলে এ প্রতিযোগিতা। বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাইকৃত প্রতিযোগীদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা তিনটি করে ক গ্রুপ : শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি, খ গ্রুপ : ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি, গ গ্রুপ: নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ১৩ই ডিসেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি সভাপতিত্ব করেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

জাতীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা ২০১৯-এর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে একজন করে, প্রতিটি বিভাগে ক, খ, গ শাখায় ৩ জনকে, ৬ টি ক্যাটাগরিতে ১৮ জন এবং ৮ বিভাগে মোট ১৪৪ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করে পুরস্কৃত করা হয়। ■

সাদিয়া হোসেন মিম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

মো. আবিদ হোসেন, ৭ম শ্রেণি, ভেটিমারি উচ্চ বিদ্যালয়, লালমনির হাট

নিবন্ধ

অন্য বাংলাদেশ

শাহানা আফরোজ

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা পেয়েছি শস্য-শ্যামল আমাদের মাতৃভূমিকে। বন্ধুরা, তোমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ দেখনি কিন্তু পেয়েছ লাল-সবুজ পতাকা আর স্বাধীন ভূ-খণ্ড। তাই তো আমরা সবাই হৃদয়ে ধারণ করি আমাদের এই দেশকে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন খুঁজে বেড়াই বাংলাদেশকে। এমনিই খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি আরো বাংলাদেশ। আমাদের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এসব গ্রাম ও জেলার নামকরণ করা হয়েছে। এসো জেনে নেই অন্য বাংলাদেশের কথা।

কাশ্মিরের বাংলাদেশ

বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাশ্মীরে রয়েছে বাংলাদেশ নামের এক গ্রাম। আমাদের দেশের মতোই সবুজ আর ছায়া ঘেরা। কাশ্মিরের উত্তরের জেলা বান্ডিপুর থেকে মাত্র ৫ কি.মি. পূর্বে বাংলাদেশ গ্রামের অবস্থান। গ্রামটি ভাসমান উলার হ্রদের তীরে তাই চারদিকে পানি বেষ্টিত। সীমানা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। অনুন্নত এলাকা বলে ৫/৬টি ঘর আর ৫০ জন মানুষ নিয়ে এই গ্রামের যাত্রা শুরু। তবে এখন আর সেরকম নেই। ঘরের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি আর জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ। স্কুল হয়েছে, তবে উন্নত দেশের মতো তেমন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। তাই এই গ্রামের নাম বাংলাদেশ হওয়ার পেছনে রয়েছে অদ্ভুত এক কাহিনি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হলো। পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যা করে এদেশের জনগণকে। সহিংসতা চালায় সারাদেশ জুড়ে। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ঠিক যে মুহূর্তে বাংলাদেশের গ্রামগুলো পুড়ছিল সেই মুহূর্তে কাশ্মিরের জুরি গ্রামে হঠাৎ আগুন লাগে। পুড়ে যায় গ্রামটি। গ্রামের মানুষগুলো পোড়া গ্রাম থেকে একটু দূরে গড়ে তোলে আরেকটি গ্রাম। তখন ডিসেম্বর মাস। আমাদের বিজয় পতাকা উড়ছে ঘরে ঘরে। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় হয় 'বাংলাদেশ' নামক নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আবেগ আর ভালোবাসায় জুরি গ্রামের মানুষ নতুন গ্রামের নাম রাখে বাংলাদেশ। ২০১০ সালের এই গ্রামটি স্বীকৃতি পায় কাগজে কলমে।

আর্মেনিয়ায় বাংলাদেশ

গ্রাম নয় রীতিমতো বাংলাদেশ নামে একটি জেলা রয়েছে আর্মেনিয়ায়। এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দেশ আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভান। পাহাড় পর্বত ঘেরা ইয়েরেভানের আয়তন ১৯ হাজার ৮০০ বর্গ কি.মি.। সেখানের একটি জেলা বা এলাকার নাম বাংলাদেশ।

তবে তোমরা কোথাও বাংলাদেশ কথাটা লেখা দেখতে পাবে না। কেউ যদি আর্মেনিয় ভাষা জানো তাহলে সে ঠিকই পড়তে পারবে বিলবোর্ড লেখা এলাকার নাম বাংলাদেশ। অফিসিয়াল নাম 'মালাতিয়া সেবাস্তিয়া' তবে স্থানীয়রা বাংলাদেশ নামেই এলাকাটাকে চেনে।

ইয়েরভানের ১২টি বিভাগের মধ্যে মালাতিয়া সেবাস্তিয়া মানে বাংলাদেশ অন্যতম। জনসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। কেন আর্মেনিয়ায় বাংলাদেশ নামে এলাকার নাম হলো তা জানার আগে আমরা একটু পিছনের ইতিহাসে তাকাই। অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে ইন্ডিয়া কোম্পানির লবণের ব্যাবসা ছিল। এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ দায়িত্ব পাওয়া ঠিকাদারের অধিকাংশ ছিল আর্মেনিয়ান। ভাগ্য বদলের লক্ষ্যে ঢাকায় আসা আর্মেনিয়ানরা অল্প সময়েই প্রভাবশালী হয়ে উঠে। নিজেদের ব্যাবসাবাণিজ্য দ্রুত বিস্তারের মাধ্যমে দ্রুতই প্রভাবশালী হয়ে উঠে। তাই আর্মেনিয়ানরা ঢাকার যে এলাকায় থাকতেন সেই জায়গাটির নাম হয়ে যায় আরমানিটোলা। আজও উজ্জ্বল সেই নাম। সেখানে একটি গির্জাও আছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের পর ইয়েরেভানের জায়গাটির নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ'। এই নামকরণের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। যেমন কেউ কেউ বলে আর্মেনিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তান অস্বীকৃতি জানায়। তাই পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণাবোধ, প্রতিবাদ আর আমাদের দেশকে ভালোবেসে এলাকার নাম হয়েছে বলে মনে করা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই জায়গার নাম বাংলাদেশ রাখা হয়েছে। তবে এখনো কিন্তু মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না এই বাংলাদেশকে। আশা করছি শিগগিরই পেয়ে যাব। মানচিত্রে থাকুক বা না থাকুক আমাদের হৃদয়ে আছে বাংলাদেশ। সেটি পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন। সুন্দর ছিমছাম গোছানো জেলা বাংলাদেশ সবুজ অরণ্যে ঘেরা। এখানে গরমের সময় খুবই গরম। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকে হিমাংকের নিচে। ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. ইসতাক হোসেন-এর হাতে 'পুত্র' প্রযোজনার জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-২০১৮ পুরস্কার তুলে দেন, ৮ই ডিসেম্বর ২০১৯

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

ডিএফপি'র সেরা অর্জন

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

অটিজম সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃজনশীলতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র 'পুত্র'। অটিস্টিক শিশুদের গল্প নিয়ে নির্মিত এটিই দেশের প্রথম চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ ছবিটি প্রযোজনা করেছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড।

অটিস্টিক শিশুদের সমাজে বোঝা মনে করা হয়। সঠিকভাবে তাদের যত্ন নিলে এবং সুস্থ মানসিকতা নিয়ে তাদের সাথে মিশলে তারাও স্বাভাবিক শিশুর মতো হতে পারে। এমনি গল্পে চলচ্চিত্রটিতে একজন অটিস্টিক শিশুকে মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে ভালো করে তোলার এক মহতী প্রচেষ্টাকে দেখানো হয়েছে।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৮ই ডিসেম্বর ২০১৯-এ জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭-২০১৮। পূর্ব ঘোষিত বিভাগগুলোতে বিজয়ী তারকাদের হাতে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৭ সালের জন্যে 'ঢাকা অ্যাটাক' এবং ২০১৮ সালের জন্য 'পুত্র' কে দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার। ২০১৮ সালে দর্শকদের মন জয় করা 'পুত্র' চলচ্চিত্রটি বাজিমাত করেছে পুরস্কারের সংখ্যায়। ৪৩ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার 'পুত্র' চলচ্চিত্রটি সর্বোচ্চ ১১টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায়।

পুত্র ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সামাজিক ধর্মী একটি চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে নির্মিত এ ছবিটি পরিচালনা করেছেন সাইফুল ইসলাম মান্নু। কাহিনি লিখেছেন হারুন রশীদ। ছবিটির মূল

‘পুত্র’ চলচ্চিত্রের ১১টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারের তালিকা			
পুরস্কার	**বিভাগ**	**বিজয়ী**	**ফলাফল**
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৮	শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	পুত্র	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ অভিনেতা	ফেরদৌস আহমেদ	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী	ফাহিম মোহতাসিম লাজিম	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠশিল্পী	নাইমুল ইসলাম রাতুল	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ নারী কণ্ঠ শিল্পী	সাবিনা ইয়াসমিন	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ গীতিকার	জুলফিকার রাসেল	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ চিত্র নাট্যকার	সাইফুল ইসলাম মান্নু	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা	হারুন রশীদ	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদক	তারিক হোসেন বিদ্যুৎ	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ শব্দ গ্রাহক	আজম বাবু	বিজয়ী
	শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা	সাদিয়া শবনম শান্ত	বিজয়ী

চরিত্রে অটিস্টিক শিশুর ভূমিকায় অভিনয় করেছে নবাগত শিশু শিল্পী ফাহিম মুহতাসিম লাজিম। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন, জয়া আহসান, আজিজুল হাকীম, শর্মীমালা, লায়লা হাসান, ডলি জহুর, মনির খান শিমুল, শামস সুমনসহ আরো অনেকে। সরকারি অনুদানে নির্মিত এ ছবিটি ১০৬টি হলে একসাথে মুক্তি পায়। শিশুটির বাবা মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফেরদৌস ও শেওতি। ■

মজার দিন

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

পরীক্ষা শেষ
লাগছে যে বেশ
করছি আমি আরাম আয়েশ
খাচ্ছি আমি দুধের পায়েশ।
আরো খাচ্ছি পিঠাপুলি
পড়ছি বসে ঠাকুমার ঝুলি
যাব মামাবাড়ি
মজা লাগবে ভারি।
পড়াশোনার ছিল অনেক চাপ
এখন পেয়েছি একটু ফাঁক।
সেথায় আছে মামা
কিনে দিবে জামা।
আছে ঈশিতা মণি
সে যে সোনার খনি
যদি বেড়াতে যাই
অনেক মজা পাই।
আছে বড়ো ভাই
বিকেলে খেলি তাই।
মামা বাড়ির খেলা
স্মরণীয় এক বেলা।

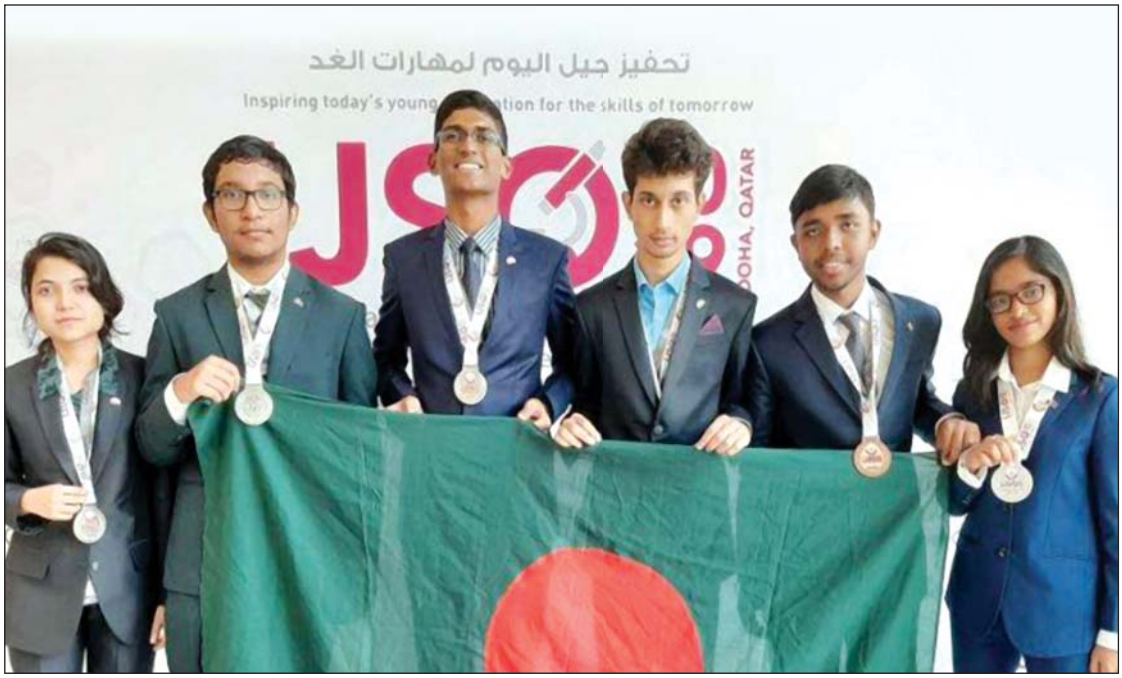

বাংলাদেশের রেকর্ড সাফল্য

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কাতারের রাজধানী দোহায় ১৬তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড (আইজেএসও) অনুষ্ঠিত হয় ৩ থেকে ১১ই ডিসেম্বর। অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ চারটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। ৭০টি দেশের অংশগ্রহণে অনূর্ধ্ব-১৬ বছর বয়সিদের নিয়ে অলিম্পিয়াডটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ সদস্যের বাংলাদেশ দল অংশ নিয়ে সবাই পদক জয়ের গৌরব অর্জন করে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল পঞ্চমবারের মতো অংশ নেয়।

৭০টি দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের উপর প্রতিযোগিতা করে এই গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। আইজেএসও-তে এটা বাংলাদেশের এমন এক সাফল্য যা আমাদের আনন্দিত ও গর্বিত করে। ১১ই ডিসেম্বর দোহায় কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে এক জমকালো অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের পক্ষে রৌপ্যপদক জয় করেন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের অভিষেক মজুমদার সন্তু, বরিশাল ক্যাডেট কলেজের মুহতাসিন আল ক্বাফি, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের কাজী তাসফিয়া জাহিন, ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের জাকিয়া তাজনূর চৌধুরী দিয়া। এছাড়া ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের জুহায়ের মাহদিউল আলম আশফি এবং গ্রিন ফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আহমেদ আল জুবায়ের আনাম। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৪ বছরে বাংলাদেশ দল ৬টি রৌপ্য ও ১১টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছিল।

রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের খুদে দলের ১০টি পদক

থাইল্যান্ডের চিয়াংমাইয়ে অনুষ্ঠিত হলো ২১তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড। এতে বাংলাদেশের ১৫ সদস্য দলের খুদে সদস্যরা পেয়েছে ১টি স্বর্ণসহ ২টি রৌপ্য, ৬টি ব্রোঞ্জ ও ১টি কারিগরি পদক। ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৪টি দেশের প্রতিযোগীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের ২১তম আসর শুরু

হয়। রোবট অলিম্পিয়াডে এটি ছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় অংশগ্রহণ।

এ বছর বাংলাদেশে রোবট অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্বের আগে ২৫টি জেলায় ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাকটিভেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এরপর ১৫ সদস্যের দল নির্বাচন করে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড আয়োজকরা। এই সাফল্যের মাধ্যমে বিডিওএসএন বাংলাদেশ দলকে নির্বাচন করেছে ১৬তম ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য। এতে ৬-২৫ বছর বয়সি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ২০২০ সাল থেকে বিশ্ব রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবে। রোবট অলিম্পিয়াডের আয়োজক ছিল বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। ■

স্বাধীনতা

মুশফিকুর রহমান মিদুল

স্বাধীনতা তুমি রক্তে রাঙানো
একটি গোলাপ ফুল
স্বাধীনতা তুমি ত্রিশ লক্ষ শহিদের
পায়ের ধুল।

স্বাধীনতা তুমি
বীর সৈনিকের উজ্জ্বল সূর্য শিখা
স্বাধীনতা তুমি
সবুজের মাঝে রক্তমাখা পতাকা।

স্বাধীনতা তুমি
উনিশ শতকের একাত্তরের কথা
স্বাধীনতা তুমি
১৬ই ডিসেম্বর
বিজয়ের মালাগাঁথা।

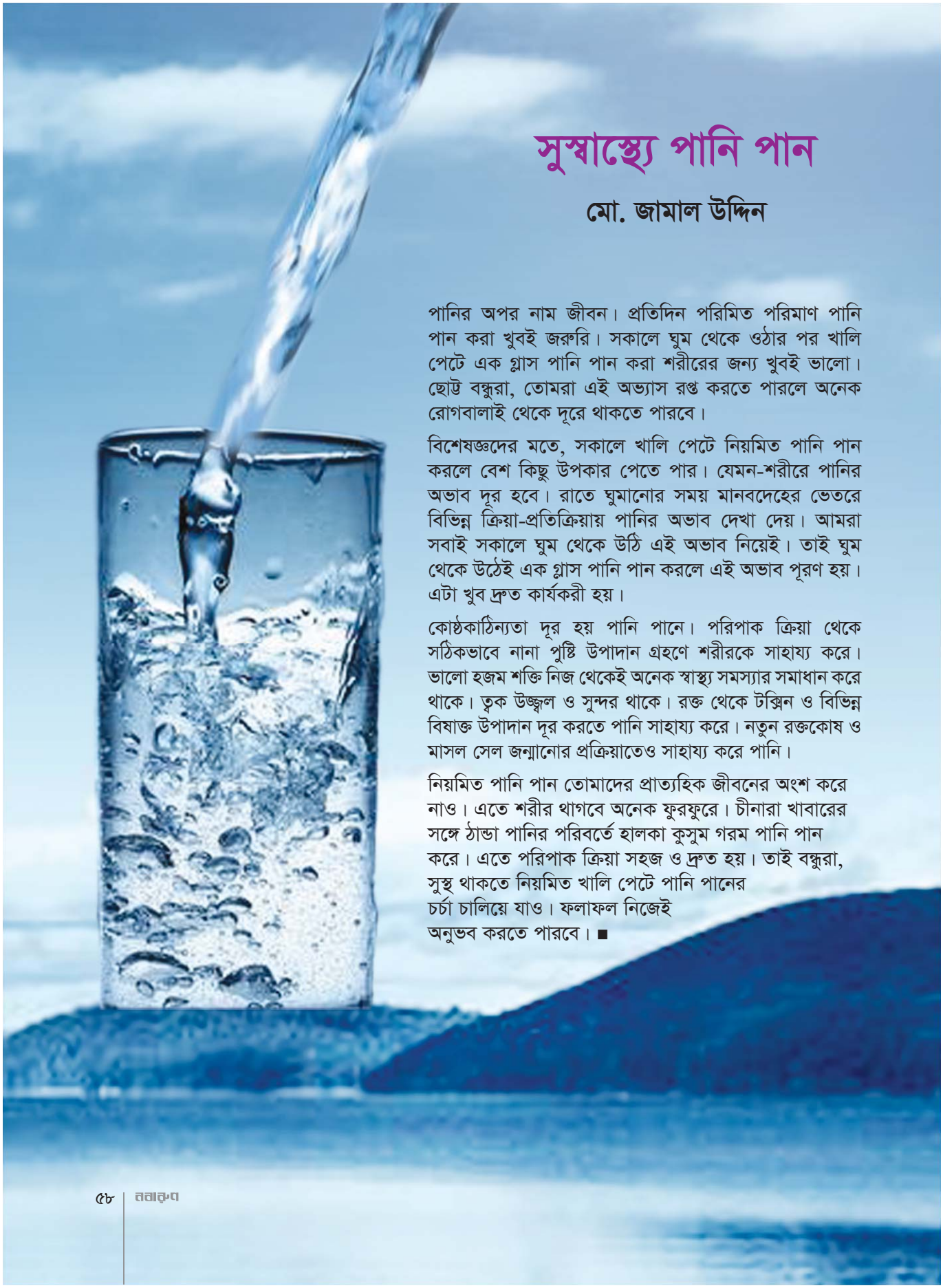

সুস্বাস্থ্যে পানি পান

মো. জামাল উদ্দিন

পানির অপর নাম জীবন। প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ পানি পান করা খুবই জরুরি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর খালি পেটে এক গ্লাস পানি পান করা শরীরের জন্য খুবই ভালো। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এই অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকতে পারবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে খালি পেটে নিয়মিত পানি পান করলে বেশ কিছু উপকার পেতে পার। যেমন-শরীরে পানির অভাব দূর হবে। রাতে ঘুমানোর সময় মানবদেহের ভেতরে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পানির অভাব দেখা দেয়। আমরা সবাই সকালে ঘুম থেকে উঠি এই অভাব নিয়েই। তাই ঘুম থেকে উঠেই এক গ্লাস পানি পান করলে এই অভাব পূরণ হয়। এটা খুব দ্রুত কার্যকরী হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর হয় পানি পানে। পরিপাক ক্রিয়া থেকে সঠিকভাবে নানা পুষ্টি উপাদান গ্রহণে শরীরকে সাহায্য করে। ভালো হজম শক্তি নিজ থেকেই অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করে থাকে। ত্বক উজ্জ্বল ও সুন্দর থাকে। রক্ত থেকে টক্সিন ও বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদান দূর করতে পানি সাহায্য করে। নতুন রক্তকোষ ও মাসল সেল জন্মানোর প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করে পানি।

নিয়মিত পানি পান তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ করে নাও। এতে শরীর থাগবে অনেক ফুরফুরে। চীনারা খাবারের সঙ্গে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে হালকা কুসুম গরম পানি পান করে। এতে পরিপাক ক্রিয়া সহজ ও দ্রুত হয়। তাই বন্ধুরা, সুস্থ থাকতে নিয়মিত খালি পেটে পানি পানের চর্চা চালিয়ে যাও। ফলাফল নিজেই অনুভব করতে পারবে। ■

প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

মো. তৈয়ব হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে নেতিবাচক মানসিকতা পরিহার করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলো না। শৈশব থেকে আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি। শিশুদেরও শৈশব থেকে এ শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা মানবিক হয় এবং আমাদের সাথে একত্রে চলতে পারে-এটিই সবচেয়ে বড়ো কথা।' ২৮ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৯ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন' উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'অভিগম্য আগামীর পথে'। ১৫ তলা বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন' থেকে শিক্ষা খেলাধুলা, প্রশিক্ষণ চিত্তবিনোদন ও স্বাস্থ্যসহ নানা সেবা পাওয়া যাবে।

অটিজম এবং প্রতিবন্ধকতা কোনো রোগ বা অসুস্থতা নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা জানি এ ধরনের প্রতিবন্ধকতায় যেসব শিশুরা ভুগছেন তাদের পিতা-মাতার জন্য এটি খুবই কষ্টের। আমরা তাদের এই দুর্দশা নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সরকার এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে যাতে অটিজম বা প্রতিবন্ধকতায় যারা ভুগছেন তারা সমাজের মূলধারার সঙ্গে বসবাস করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'তাঁর সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান করছে। তিনি বলেন, আমরা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড ও বৃত্তিও প্রদান করছি।

৮০ কোটি টাকা খরচ করে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা, পুনর্বাসন, গৃহায়ন এবং বিনোদনসহ বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে 'সুবর্ণ ভবন' নির্মাণ করেছি।'

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় প্রতিবন্ধী বালক-বালিকাদের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া ও খেলাধুলার ওপর বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নূরুজ্জামান আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

পরে প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবেশিত বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এর আগে তিনি এ ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তি, সমাজকর্মী ও সংগঠন, পিতা-মাতা এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার বিতরণ করেন।

সতর্ক থাকুন, শিশু ও নারী যাতে নির্যাতিত না হয়

কোনো শিশু যাতে নির্যাতনের শিকার না হয়, সে জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, কেবল আমাদের দেশেই নয়, আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও দেখেছি যে, শিশু ও নারীদের ওপর নির্যাতন মানসিক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তাই নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই সচেতন থাকতে হবে, যাতে কোনো শিশু ও নারী নির্যাতিত না হয়।

বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে ৯ই ডিসেম্বর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, মূলত পুরুষরাই নারীদের ওপর নির্যাতন চালায়। তাই তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরও মেয়ে শিশু আছে এবং তাদের সন্তান যদি অন্য কারো দ্বারা নির্যাতিত হয়, তাহলে তারা কী করবে। সে কারণেই এ ব্যাপারে সচেতনতা খুবই জরুরি। ■

এস এ গেমসে লাল-সবুজের সাফল্য

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, শেষ হলো সাউথ এশিয়ান গেমস বা এসএ গেমসের আরো একটি জাঁকজমক আসর। আর এ আসরেই নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স করেছে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা। ১৯টি স্বর্ণ, ৩৩টি রৌপ্য ও ৯০টি ব্রোঞ্জ সব মিলে ১৪২ পদক জিতেছে বাংলাদেশ যা, এস এ গেমসে বাংলাদেশের সেরা অর্জন। বাংলাদেশ দলকে নবারুণের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন।

১৯৮৪ সালে নেপালে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এসএ গেমসে পথচলা শুরু করে বাংলাদেশ। ২০১০ সালে বাংলাদেশ হয় তৃতীয়বারের আয়োজক। সে আসরে বাংলাদেশ অর্জন করে সর্বোচ্চ ১৮টি স্বর্ণ। এবার নেপালে ১৩তম গেমসে সব ছাপিয়ে রেকর্ড ১৯টি স্বর্ণ পেয়েছে বাংলাদেশ। ১-১০ই ডিসেম্বর কাঠমান্ডু, পোখরাসহ নেপালের তিনটি শহরে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার 'অলিম্পিক'। ২৬টি খেলার মধ্যে ২৫টিতেই অংশ নেয় বাংলাদেশ। এ গেমসে এশিয়ার ৭টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

১৯টি স্বর্ণ অর্জনে বড়ো অবদান রেখেছে লাল-সবুজের নারী ক্রীড়াবিদরা। ৬টি ব্যক্তিগতসহ মোট ১১টি স্বর্ণ এসেছে তাদের হাত ধরে। খেলাধুলায় বাংলাদেশের নারীরা দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার একটি উদাহরণ। নারীদের মধ্যে আর্চারির ইতি খাতুন ব্যক্তিগত, দলীয় ও মিশ্র দলগত দারুণ সাফল্য দেখান। বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রীড়াবিদ হিসেবে এই প্রথম এসএ গেমসে ৩টি স্বর্ণ জিতলেন তিনি। এবার বাংলাদেশের ১৯টি স্বর্ণের ১০টিই এসেছে আর্চারিতে। গেমসে আর্চারিতে ১০টি স্বর্ণের মধ্যে বাংলাদেশ সবগুলো অর্জন করে। সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশের আর্চারি এগিয়ে চলার স্বাক্ষর রেখেছে নেপালে। আর্চারি ছাড়া বাংলাদেশ স্বর্ণ জিতেছে কারাতে ৩টি, ক্রিকেটে ও ভারোত্তোলনে ২টি করে, তায়কোয়ান্দো ও ফেন্সিংয়ে ১টি করে। ■

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান

জান্নাতে রোজী

মুন্সিগঞ্জ জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮শে ডিসেম্বর টঙ্গীবাড়ি উপজেলার হাসাইল বানারী ইউনিয়নের সরকারের বানারী আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টঙ্গীবাড়ি উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাম্মৎ হাসিনা আক্তার, যিনি ইতোমধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

বাল্যবিবাহকে 'না' বলুন, কোনো অবস্থাতেই বাল্যবিবাহ দেবো না। বানারী আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারীদের এই অঙ্গীকার করানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানে হাসাইল বানারী ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। এ সময় তিনি বাল্যবিবাহ দিলে কিশোরী মেয়েদের কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে এবং ফলে জীবনহানীও ঘটতে পারে তা কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরেন।

এরপরই প্রকল্প এলাকায় মা ও শিশু, কিশোরী ও অভিভাবকদের নিয়ে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উঠান বৈঠকের বিষয় ছিল মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সমস্যা। উঠান বৈঠকে উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা হাসিনা আক্তার বয়ঃসন্ধিকালের স্বাস্থ্য বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

উঠান বৈঠকের প্রধান সমন্বয়ক উপজেলা পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা হামিদা বেগম কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের সঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালের প্রকৃতিগতভাবে দেহের কিছু অঙ্গের পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেন। এসব বিষয়ে লজ্জা না করে অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার পরামর্শ দেন তিনি। উপস্থিত কিশোর-কিশোরীদের এবং এ বিষয়ে অভিভাবকদের এগিয়ে আসারও অনুরোধ জানান।

এরপর আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তিনটি স্তরে ভাগ করা এ অনুষ্ঠানগুলোতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. জগলুল হালদার ভুতুসহ উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ■

পদ্মদিঘি

শিউলি আক্তার

আমার গাঁয়ের দিঘির জলে
পদ্ম ফুল ভাসে,
তাই না দেখে খুকুমনি
খিলখিলিয়ে হাসে।

পদ্ম ফুলে মৌমাছিরা
মধু নিয়ে যায়,
সারাদিন গুনগুনিয়ে
নেচে নেচে খায়।

খুকুমনি চুপটি করে
দিঘির জলে নেয়ে
মন আনন্দে ঘুরতে যাবে
ডিঙি নৌকা বেয়ে।

সপ্তম শ্রেণি, আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা

জায়েদ বিন রাকিব, জুনিয়র ওয়ান শ্রেণি, স্টার হাতেখড়ি ইন্টান্যাশনাল স্কুল, নরসিংদী

রাজিউর রহমান

ইংল্যান্ডের মুদ্রায় স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর ছবি

জগদীশ চন্দ্র বসুই বিশ্ববাসীকে প্রথমবারের মতো জানিয়েছিলেন উদ্ভিদের মধ্যে আছে প্রাণশক্তি। এটি প্রমাণের জন্যে তিনি 'ক্রেসকোগ্রাফ' নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা উদ্ভিদদেহের সামান্য সাড়াকে লাখো গুণ বৃদ্ধি করে প্রদর্শন করে। এবারে সেই জগদীশচন্দ্র বসুর ছবিযুক্ত মুদ্রা আসবে ইংল্যান্ডে।

জানা গেছে, ইংল্যান্ডের বাজারে ২০২০ সালে আসতে চলেছে নতুন ৫০ পাউন্ডের নোট। নোটে ছাপানো হবে বাংলাদেশি এই বিজ্ঞানীর মুখ। এমনই সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংক অব ইংল্যান্ড। এর আগে নোটে ছাপানোর জন্য একশ জন বিজ্ঞানীর নাম উঠে আসে, প্রাথমিকভাবে এই নামগুলোর মধ্যে এগিয়ে আছেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। আধুনিক বিজ্ঞানের পথিকৃত তিনি। তার ছাড়া যে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় তা প্রথম আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন আধুনিক বেতার তরঙ্গ, যা ছাড়া ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সম্ভব ছিল না। স্যার জগদীস চন্দ্র বসু নিরহংকারী ছিলেন, তাই রেডিও তরঙ্গের আবিষ্কারের জন্য জীবদ্দশায় কোনো পেটেন্ট গ্রহণ করেননি। তবে বিজ্ঞানী মহল রেডিও তরঙ্গের ক্ষেত্রে তার অবদান স্বীকার করেন এক বাক্যে। বেতার তরঙ্গের জনক আখ্যা দেওয়া হয় স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে। এছাড়া কৃষি বিজ্ঞানেও তার অবদান অসামান্য।

পরিবেশ বান্ধব ই-রিকশা 'চলো'

'পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস টুমি গ্লোবাল আরবান মোবিলিটি চ্যালেঞ্জ' নামের একটি প্রকল্পে সারা বিশ্বের মোট ১৩০টি শহর তাদের প্রস্তাবনা দাখিল করে। এই শহরগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের শহর হিসেবে নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এই প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রকল্পের আওতায় সিংড়ায় ১০টি পরিবেশ বান্ধব ই-রিকশা 'চলো' পরিবহণ প্রদান করেছে জার্মানির জিআইজেড।

২৯শে নভেম্বর ২০১৯ বিকেল সাড়ে চারটায় পৌরসভা প্রাঙ্গণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক নিজে ই-রিকশা (অটোরিকশা) চালিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এই পরিবহণের শুভ উদ্‌বোধন করেন। দূষণমুক্ত তথা জলবায়ু-বান্ধব শহর গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। যানবাহন হলো অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেত্র যা বেশি মাত্রার কার্বণ নিঃসরণের জন্য দায়ী। জার্মানির জিআইজেড –এর টুমি প্রকল্পের আওতায় টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত যানবাহন ব্যবস্থার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. জার্মানির বর্তমান চ্যান্সেলরের নাম, ৬. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, ৭. উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশ, ৯. রাজা, ১০. আকাশ

উপর-নিচ: ১. রুয়ান্ডা যে দেশের রাজধানী, ২. দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, ৩. পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ, ৪. রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির নাম, ৫. দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা, ৮. বাহরাইনের রাজধানী

১.		২.				৩.	
							৪.
				৫.			
				৬.			
	৭.	৮.					
				৯.			
১০.							

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	/		+	১	=	
/		+		*		*
	*	৩	-		=	১
-		-		-		+
৩	*		-	৪	=	
=		=		=		=
	+	৫	*		=	৬

উত্তর

অ্যা	ঞ্জে	লা	মে	র	কে	ল	
ঙ্গো		ও			নি		ভ্লা
লা		স			য়া		দি
				আ			মি
				সি	ঙ্গা	পু	র
	সো	মা	লি	য়া			পু
		না		ন	র	প	তি
আ	স	মা	ন				ন

সমাধান

৮	/	৪	+	১	=	৩
/		+		*		*
২	*	৩	-	৫	=	১
-		-		-		+
৩	*	২	-	৪	=	২
=		=		=		=
১	+	৫	*	১	=	৬

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধার ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: অনিন্দ্যসুন্দর, পিপাসু, গরহাজির, পনির, নাপিত, পর্বত, বেনজির, বেত, ঘর, মলম, লতা, গরম

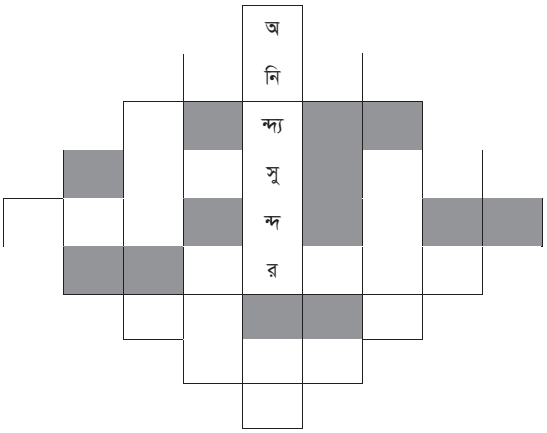

গত সংখ্যার সমাধান:

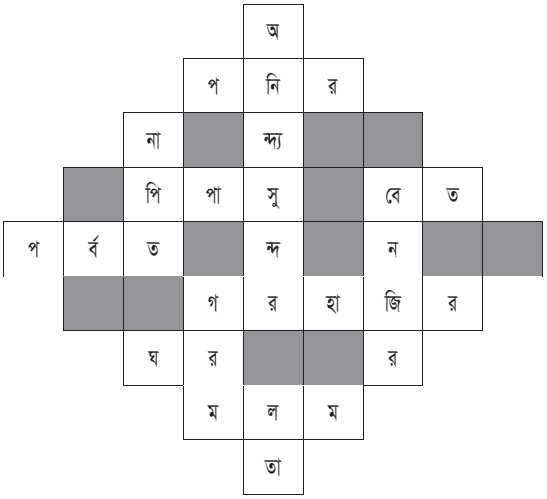

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৬৭					৫৮	৪৯		৪৭
		৭৮	৬৩	৬০			৫১	
				৬১	৫৬	৫৫		
	৮১	৭৬	৭৫	৩৮		৫৪	৫৩	
৭১			৭৪		৪০			৪৩
১০		১৪		৩৬		২৮		২৬
	১২		১৬		৩৪		৩০	
	৫		৩	১৮		৩২		
৭		১		১৯				২৩

সমাধান

৬৭	৬৬	৬৫	৬৪	৫৯	৫৮	৪৯	৪৮	৪৭
৬৮	৭৯	৭৮	৬৩	৬০	৫৭	৫০	৫১	৪৬
৬৯	৮০	৭৭	৬২	৬১	৫৬	৫৫	৫২	৪৫
৭০	৮১	৭৬	৭৫	৩৮	৩৯	৫৪	৫৩	৪৪
৭১	৭২	৭৩	৭৪	৩৭	৪০	৪১	৪২	৪৩
১০	১১	১৪	১৫	৩৬	৩৫	২৮	২৭	২৬
৯	১২	১৩	১৬	১৭	৩৪	২৯	৩০	২৫
৮	৫	৪	৩	১৮	৩৩	৩২	৩১	২৪
৭	৬	১	২	১৯	২০	২১	২২	২৩

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন

১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন

www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-6, December 2019, Tk-20.00

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, দ্বিতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, বনশ্রী, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা